Dhumro pahar

Sheyal

Nijhum

Gargi Bhattacharya

ধুম্র পাহাড়

শেঁয়াল

নিঝুম

গার্গী ভট্টাচার্য

<u>এক তারার টুং টাংকে ,</u>

ভূত দেখেছো নাকি তুমি

ওহে মায়াবী মণিহারা ??

“Normal is an illusion.

What is normal for the spider

is chaos for the fly.”

Charles Addams

My website :

www.gargiz.com

The book cover is designed by me; also the covers of my books --Tomari Sarengi,Raatpari,Keyur,

Kaalpurush O Pahari Moinaguli,

Suhel ,Sacred Lemongrass, The Cosmic Bend , Paap O Ramdhanu etc.

In this book I have used images from;

www.pixabay.com

under CCO.

কিন্ডেল বার হওয়াতে আমাদের মতন লেখকদের খুবই সুবিধে হয়েছে কারণ যখন ইচ্ছে হচ্ছে কিছু লিখে আপলোড করে দিলেই হল । পাঠকেরা পড়ে ফেলতে পারছেন । কোনো প্রকাশকের ঝামেলা নেই , ছাপার খরচ নেই আর বই এদিক থেকে ওদিকে পাঠাবার খরচও নেই কেবল খেয়াল রাখতে হয় যাতে খুব বড় না হয় তাহলে ডাউনলোড হতে অনেক সময় নেয় । এই আর কি । পাঠক পড়ে নেবেন আর দুধ কা দুধ আর পানি কা পানি হয়ে যাবে । কোনো সাহিত্যের স্বঘোষিত জ্ঞানীর চোখ রাঙানি নেই যে এই বই মন্দ কেউ পড়বে না ইত্যাদি । যুগ বদলেছে ভাই , এখন বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সময় । আমাদের বইপত্র সব দ্যাখে মানুষ নয় রোবট । কাজেই কিছু আঁতেলের গলাবাজি ও আতঙ্ক মুক্ত এই ব্যবস্থা আমাদের মতন লেখক ও কবিদের সুযোগ করে

দিয়েছে নিজেদের সৃষ্টি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য । আর বাকিটা ইতিহাস ।

আমি আত্মরতিতে বিশ্বাসী নই । সময়ই কথা বলে প্রতিটি সৃষ্টির হয়ে কারণ এক মহান স্রষ্টা সম্ভবতঃ কাফকা বলে গেছেন যে লেখা হয়ে গেলে তা হল পাঠকের । যদি ভুল বলে থাকি তাহলে এই মূর্খকে ক্ষমা করবেন । আমার পড়াশোনা খুবই কম । প্রথাগত লেখাপড়া করার সুযোগ আমার হয়নি সেরকম । কাজেই মাফ করে দেবেন নিজগুণে । আর এই সুযোগ যাঁরা করে দিয়েছেন সেই অ্যামাজনের হয়ে বলি -জয় কিন্ডেলের জয় ।

আর আমি সত্যি সত্যি মনে করি যে **Malala Yousafzai** -মালায়্লা ইউসুফকে (একে আমি এতই নগণ্য মনে করি যে এর নামটিও আমি মনে রাখতে পারিনা) যদি নোবেল দেওয়া হয় তাহলে জেফ্ বেজোজকেও নোবেল দেওয়া উচিৎ এই কিন্ডেল আবিস্কারের জন্য কারণ এই প্রযুক্তির ফলে অনেক অনেক ছাত্রছাত্রী ও

লেখক/ লেখিকা এবং পাঠক উপকৃত হচ্ছেন ও কিন্ডেল, পুস্তক জগতে এক দিগন্ত খুলে দিয়েছে ।

অনেক দামী বই আর কিনতে হয়না ।

আর অপেক্ষা করে আছি কবে আমাদের প্রিয় জেফ্ বা জেফি নোবেল হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সেই বিশ্ববিখ্যাত এক মুখ হাসি নিয়ে আমাদের মুগ্ধ করে বক্তৃতা দেবার জন্য মাইক্রোফোনটা হাতে নেবেন ও নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসবেন এক এক করে **যা মানব জীবনকে বদলে দিতে সক্ষম ।**

বদলের নামই তো প্রগতি , তাই না ?

অবশ্যই ভালো দিকে ।

জয় কিন্ডেলের জয় !

ভূমিকা : :

জীবনে এমন অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি যারা ভূত দেখেছে অথবা অনুভব করেছে । অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছে ।

ভূত হল যা গত হয়েছে কিন্তু আমরা আত্মার কথা বলছি । অনেক ভূত বিশারদ্ আত্মা কথাটি পছন্দ করেন । আর বায়বীয় অবয়ব বলাও চলে । অর্থাৎ কিছু একটা যা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে অথচ অনুভবের অন্দরে ।

এইসব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষেরা যারা , তারা আমার কাছের মানুষ অথবা বন্ধু স্থানীয় কিংবা নেহাৎই পরিচিত কেউ । এইসব মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া নানান অভিজ্ঞতা থেকে আমার কাছে জমা হল বিশাল

এক পুঁথি কারণ আমি এইসব ঘটনা সংগ্রহ করতে ভালোবাসি । এটা আমার প্যাশান । আর ভালোবাসি শ্মাশান , কবর ও মড়া পোড়ানোর স্থানে ঘুরতে । এগুলো আমাকে একধরণের কিক্ দেয় । জ্বলন্ত চিতার যে শব্দ তা থেকে আমি জীবনের অনু পরমাণু খুঁজে ফিরি । কী এই জীবন ? কেন এই স্পন্দন ? কেন এই বীক্ষণ ? অথচ কেউ একে এড়াতে পারেনা । এই চিতায় সব নাশ হয়ে যায় একদিন । বড় বড় কথা, অহং, মনের ব্যাথা , অত্যাচার , নৃশংসতা সবটাই । তবুও মানুষ বাঁচে । পলাশ ও বকুলের সুঘ্রাণে , তিতাস নদীর ছায়ায় । কেন ? এই কেন আমাকে বারবার টেনে নিয়ে যায় মহাশ্মাশানে ।

শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদে আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে । বরং শ্মশানে একভাড় চা নিয়ে আমি মড়া পোড়ানো দেখতে পারি আর তান্ত্রিক বা অঘোরী সাধুর সাথে গল্পগাথায় সময় কাটাতে পারি । আমি এমনই ! রং চটা ও ছাল ঝরে পড়া এক মানুষ যে প্রকৃতি ও রং এর মধ্যে বাঁচে । কৃত্রিমতা আমার গলা টিঁপে ধরে । তাই তো মনে হল এবারে আমি এই ব্যাক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু গল্প নিয়ে পুঁথি আকারে মেলে ধরি । অন্যদের সাথে শেয়ার করি । ভয় লাগবে কিনা জানিনা তবে অন্যরকম একটা

শিহরণ হবেই সেই বিষয়ে আমি একদম শিওর । পড়েই দেখুন তবে ।

অনেকেই এগুলি মানেনা । তাতে কিছু যায় আসেনা । এগুলি নিছকই গল্প লিখেছি । সেইভাবেই পড়ুন । আর একটু ভয় পান । মাঝে মাঝে জীবনের একঘেয়েমি থেকে বার হতে একটু **ভয় অভিযান** মন্দ কি ? তাই না ? তবে হৃদরোগে আক্রান্ত হবেন না সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত ☺

তাহলে শুরু করা যাক্ নৈশ অভিযান ,জিঘাংসা খচিত ভয়াল পর্ব ।

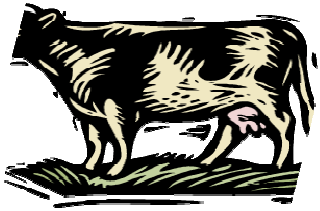

গো-ভূত

ভূতের বাড়ি

একটি মড়ার খুলি । বড়সড় সাইজের এই খুলির কান্ডকারখানা দেখলে অবাক হতে হয় । খুলিটিকে আনা হয়েছিলো **শ্মশ্মান** থেকে । আনে কুহুর বাবা বিরাজ বাবু । বিরাজ বৈদ্য । ডঃ বিরাজ বৈদ্য ।

হ্যাঁ , ইদানিং একটি ডঃ উপাধি বসেছে ওনার নামের আগে । এই প্রবীণ বয়সে । বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক বিরাজ বাবু এমনিতে যথেষ্ট ধনবান । কারণ পৈত্রিক সম্পত্তি । ধান ও পাটের ক্ষেতের মালিক এছাড়া গবাদি পশু আছে । কলকাতায় রীতিমতন দুধ সাপ্লাই দেন । হরিণঘাটার মতন । কিন্তু স্কুল শিক্ষকতায় হাতযশ আছে । ওনার বহুদিনের শখ ছিলো একটি ডক্টরেট করবার কারণ চাষী পরিবারের হলেও উনি কিন্তু রাতের বেলা

নিজের লাইব্রেরীতে বসে সময় কাটান । গাঁয়ের প্রথম লাইব্রেরী ওনার বানানো । কারণ পুঁথি পড়ার অভ্যাস করা ।

বিড়ি , সিগারেট , গাঁজার অভ্যাস নেই । নেই নারীদোষ । বই, বই আর বই । কেবল যদি একটা পি-এইচ-ডি হতো তার ! পৈত্রিক ব্যবসা তো দেখাশোনার জন্য ম্যানেজার আছে আর আছে তার ছোট ভাই স্বরাজ । সে দাদা অন্ত প্রাণ । কলকাতা থেকে সে পড়ালেখা করে এসেছে । বিরাজ বাবুর সংসারে কোনো ঝামেলা নেই । মিলেমিশে থাকে সবাই । কিন্তু ঐ একটাই ক্ষোভ , যদি একটা ডক্টরেট থাকতো !

ওনার গিন্নী বলেন , তা আজকাল তো টাকা দিলে সবই হয় তাহলে একটা ডক্টর-এট হবেনা ? কত লাখ নেবে সেটা খোঁজ নাও ।

--- ছিঃ ছিঃছিঃ ছিঃ করে ওঠেন বিরাজ বাবু ! বলো কি ? শেষমেশ টাকা দিয়ে ডিগ্রী ? হায় হায় ! কি ছাইপাশ বুদ্ধি দিচ্ছো ?

মোটা গিন্নী নমিতা যার দেহের ভারে কমবয়সেই বাতে ধরেছে তাই নড়াচড়া সীমিত হয়ে গেছে সে মুখের পান থুক্ করে পানের বাটায় ফেলে গোলগোল দুই চোখ

উল্টো , মুখভঙ্গী করে বলে ওঠে , কিছু বুঝিনা বাপু , সবই টাকা দিয়ে হচ্ছে তা এটা হলে দোষের কি ? তুমি তো এটা দিয়ে কিছু করবেই না, শুধু দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখবে তালে ? ঐ ওখানে , বলে দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে- তোমার বাপ্ ঠাকুদ্দার ছবির পাশে আটকে রাখবে ভাবলাম ।

বিরাজ বাবু এর আর উত্তর দেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না । কি আর বলবেন ?এইসব বোকা , মূর্খ মানুষের দল , খালি খায় আর ঘুমায় ! একটা পি-এইচ-ডির মূল্য বোঝে সাধ্যি কি এদের ? কাজেই তক্কো করে যুক্তি দিয়ে লাভ নেই কোনো বরং কাজে লেগে পড়া যাক্ । এই মনে করে ওখান থেকে সরে পড়লেন ।

গিন্নী বেগতিক দেখে দু-চারখানা চাকর ডেকে চুল বাঁধতে বসলেন ।

আমাদের এহেন ডক্টরেট পাগ্লা বিরাজ বৈদ্য মহাশয় অবশেষে একখানা ডিগ্রী হাসিল করেই ছাড়লেন । পড়তে পারতেন খুব । সারাটা রাতই লাইব্রেরীতে কাটাতেন । আর সংগ্রহে ছিলো অজস্র পুস্তক । অনুসন্ধিৎসাও খুব ছিলো । কাজেই হাতে সময় নিয়ে উনি অবশেষে বাংলা ও

ভারতীয় সাহিত্যে ভূত ও প্রেত নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করলেন এবং এক চমৎকার থিসিস্ লিখে ফেললেন । আর তাতেই কেল্লা ফতে ! পেয়ে গেলেন ভূতের ওপরে একটি দূর্দান্ত পি-এইচ-ডি ।

কিন্তু সত্যি কি ভূত বলে কিছু হয় ?

সেটা ওনার পরীক্ষা করা কাজ নয় । কাজ হল এই নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে পরিবেশন করা । উনি বিজ্ঞানী কিংবা র‍্যাশানালিস্ট নন । কোনো বিজ্ঞান মঞ্চ খোলেন নি । বরং নানান ব্যবসা করে থাকেন চাষবাস সংক্রান্ত আর এই ভৌতিক গবেষণার বই লেখা । সে যাইহোক্ সেই ব্যাপারেই শ্মাশানে যাতায়াত শুরু এবং ঐ খুলিটি আসে ওদের বাসায় । এখন সেই খুলি রোজ গল্প শোনায় । তার স্টকে নাকি বহু বহু গল্প আছে । সেসব শেষ হলেই তাকে গঙ্গায় বা পুণ্য নদীতে ভাসানো যাবে । তার আগে নয় । খুলি যখন মানুষ ছিলো এসব নাকি তখনকার দেখা ঘটনা । এসব না বলতে পারলে সে মুক্তি পাচ্ছে না । তাই বলে যেতে চায় । আদতে সে ছিলো এক ঘোস্ট হান্টার । ভূত শিকারি । তার অপঘাতে মৃত্যু হয় । এক মহিলা তান্ত্রিক , সাধনার জন্য এই মানুষটিকে হত্যা করে তবে অতি সুক্ষ্ম এক কায়দায় যাতে আইনের হাতে না পড়ে । তখন থেকেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে । তবে তার

অপঘাতে মৃত্যুর ঘটনাও সে শুনিয়ে ছাড়বে । প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে এক একটি করে গল্প শোনাবে । তারপর তাকে গঙ্গায় নিমজ্জিত করা যাবে । এরকমই কথা হয়েছে । বিরাজ বাবুর সাথে । এদিকে বলা হয়নি বিরাজ বাবুর দুই কন্যা । কুহু আর তুঁহু । কুহু সাধারণ মেয়ে একটি আর তুঁহু একটু ক্ষ্যাপাটে, ওর বাবার মতন । ওর বাবা যেমন ডক্টরেট পাগল সেরকম তুঁহু হল বিখ্যাত হবার জন্য পাগল । ফেমাস হবার জন্য সে অনেক কিছু করতে পারে । তাই সে স্থির করেছে যে এই করোটির কাছ থেকে গল্পগুলো শুনে লাইভ টেলিকাস্ট করে একেবারে ধুন্ধুমার কান্ড করে ফেলবে । এমনিতেই তার ইউ-টিউবে ভক্ত সংখ্যা মিলিয়ন ছাড়িয়েছে । অবশ্যি সে পরিশ্রমও করে তার জন্য । ভ্রমণ ভিডিও ও নানান উপাদেয় ভিডিও তৈরি করে সে । লোকেরা খুব পছন্দ করে । সম্প্রতি একটি বড় চ্যানেল থেকে ডাক পেয়েছে । তারপরে দিদি নম্বর ওয়ানে জিতে এসেছে । বেশ ভালো কাজ করছে ।

তবে সমস্যা একটু হয়েছে । খুলি কিন্তু লাইভে গল্প বলতে নারাজ । তো তাতে তুঁহু বলেছে যে সেসব ঠিকই আছে , ও গোপনে বলুক সে রেকর্ড করে পরে দেখাবে ।

লোকে হয়ত অবিশ্বাস করতে পারে তবে কি আর করা যাবে, সব তো হয়না একসাথে !

আমাদের সাধারণ মানুষদের কাছে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা হল একইরকম । কিন্তু ভূত গবেষক কিংবা

অঘোরী/তান্ত্রিকদের কাছে এগুলির গুরুত্ব অপরিসীম ।

এরা নানান সজ্জায় সজ্জিত ।

শনি অমাবস্যা , মহালয়া অমাবস্যা , মৌনি অমাবস্যা , ভৌমবতী অমাবস্যা, সোমাবতী অমাবস্যা কৌশিকী অমাবস্যা , কোজাগরী পূর্ণিমা , ত্রিপুরারি পূর্ণিমা, গুরু পূর্ণিমা , শাকম্ভরী পূর্ণিমা আরো না জানি কত কি !

এসব সময় তন্ত্রমন্ত্র বিদ্যাধারীগণ ভূত প্রেত নিয়ে কতকি করে থাকে ঐ চাঁদের ওঠানামার ওপরে নির্ভর করে । এছাড়া চাঁদ এর অর্থ হল আমাদের মন । মনের গোপন

তত্ত্ব ও তথ্য । তাই এই সময় মনের ওপরে প্রভুত্ব ফলানো সহজ হয় । গুহ্যবিদ্যা মতে ।

প্রতিটি চাঁদের তিথিতে এই করোটি নড়ে চড়ে সজীব হয়ে ওঠে এবং এক একটি জীবন্ত গল্প বলে চলে যা আমরা এবার শুনবো ।

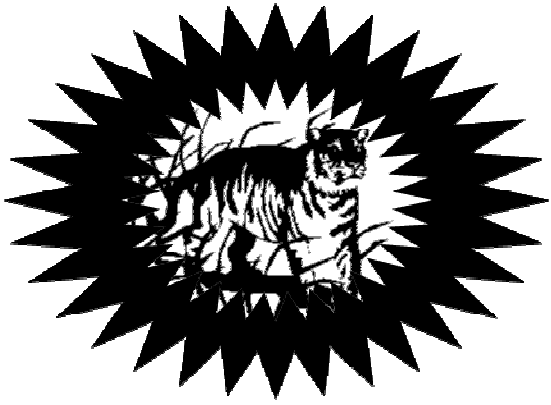

বিরাজ বৈদ্য ,প্রথমে এই বই লেখার কাজে এক গ্রামে যান যেই গ্রাম শোলাগ্রাম নামে পরিচিত ।

এই গ্রামের নাম শোলাপুর । অঢেল শোলার শিল্পকার্য হবার সুবাদে এই গ্রাম শোলাগ্রাম নামে পরিচয় পেয়েছে যদিও । শোলা তো একজাতীয় গাছ থেকে নেওয়া হয় তারপরে তা শুকিয়ে , কেটে , ছাল ছাড়িয়ে সেসব বার করে সাইজ মতন কাটাকুটি করে টরে নানান আকৃতি দান করা হয় ও শৈল্পিক রূপ দেওয়া হয় । বছরে ৬ মাস এই গ্রামের লোক এসব কাজে নিযুক্ত থাকে আর বাকি ৬ মাস তারা চাষবাসে মন দিয়ে ফলন ফলায় । শোলার কারুকার্য দেখবার মতন । প্রতিটা ঘরের ছাদে শোলা জমানো । ছেলেবুড়ো সকলে শিল্পী । সবাই মন দিয়ে কাজ করছে । মাকালী, দুগ্গার মুকুট , ডাকের সাজ , হাতের সাজসজ্জা সমস্ত তৈরি হচ্ছে এখানে । কেউ কেউ পুঁথির কাজেও ওস্তাদ । বহু মানুষ এসে ভিডিও করছে । দারুণ ব্যাপার । এমত অবস্থায় বিরাজ বৈদ্য এলেন এদেরই শ্মাশানে । এখানে এক কাপালিকের বসবাস । লোকটি হাতও দেখে । কাজেই তার কাছে ভালোই লোক জড়ো হয় । অনেকে প্রতিমার সাজসজ্জা কিনতে এসেও ওদিক পানে ঢুঁ মেরে যায় ।

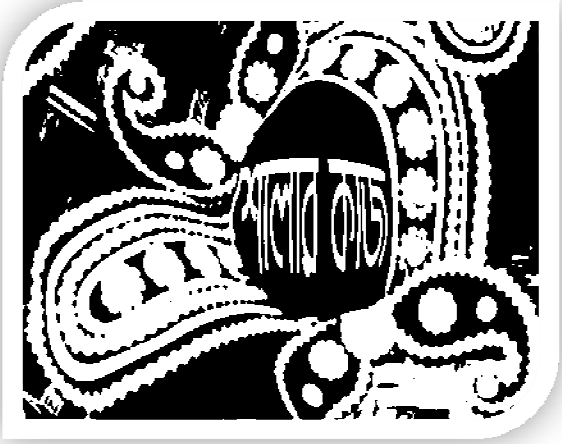

এই কাপালিক মহাশয় অত্যন্ত নামী, এই চত্বরে ।তারই কাছ থেকে নানান ঘটনা শোনার জন্য বিরাজ বাবু হাজির হন তার কাছে এবং এই করোটি খানা উপহার স্বরূপ পান । উনি বলেন, আরে মশাই আমি কোনো ভবিষ্যৎ বলিনা । আমার এই খুলিগুনো বলে । ওরাই আমার স্যাঙাৎ । ওদের ভেতর দিয়েই সব কথা বার হয় । আমার সেরকম কোনো দিব্যদৃষ্টি আজও হয়নি । মা শ্মশানকালী আজও আমায় সেই ক্ষ্যামতা দেননি । আমি জপতপ করি এই পর্যন্তই । স্বপ্নে মা আমায় বলেন এই

শোলাগ্রামে এসে ঠাঁই নিতে তাই এখানে পড়ে আছি ।মানুষের উপকার করতে বলেন ।কালীপুজোর সময় মদ গিলি । মাংস খাই আর সাধনা করি । মড়ার ওপরে বসে । আর আমার খুলি কথা বলে । বড় বচনবাগীশ ঐ ওরাই । তবে বেচাল দেখলে ঘাড় মটকাতেও ওরা পিছপা হবেনা । শঙ্খিনী , ডাকিনী , কর্ণপিশাচিনী সব আসে আমার কাছে । এসব কোনো ছেলেখেলা নয় । প্রাণের মায়া কেবল নয় , এসব ধরলে জন্মজন্মান্তরের মতন খেয়ে নেবে একেবারে ! সাবাড় করে দেবেখন । এর থেকে দূরে থাকাই ভালো ।

তা আর কইতে ?

নিজের ঘরে একটি খুলি নিয়ে গিয়ে বিপদে পড়েন বিরাজ বৈদ্য ! এই খুলি ঐ কাপালিকই উপহার দেন । বলেন যে কোনো শয়তানি করবে না । তা করেনি হয়ত কিন্তু ঐসব ভয়াল গল্প শোনা তো সহজ নয় তাইনা ?

কাপালিক বাবাকে সবাই ডাকে জটাবাবা নামে । উনি বলেন যে তাকে নাকি মা শ্মশানকালীই স্বয়ং ঐ শোলাগ্রামে ডেকে নিয়ে যান । কারণ ঐ গ্রাম খুবই পবিত্র । তার একটি কারণ এই যে ওখানে প্রতিবছর পুজোর সময় শোলার নানান কাজগুলো হয়ে থাকে তা ছাড়াও

ওদের জেলেপাড়ায় যেখানে আদি বৈচি নদী আছে সেখানে নাকি জেলেরা প্রতি বৎসর দুগ্গা পুজো করে আর বসন্ত কালে বাসন্তীপুজো করে । সেইসব ঠাকুরের মূর্তি তৈরি হয় মাছের আঁশ দিয়ে । নিজেরাই বানায় । গ্রামের বামুনদের সাথে ঝামেলা দিয়ে শুরু হয় মারামারি কাটাকাটি আর তারপরে ওরা নিজেরাই ঐ পুজো শুরু করে । আর মজার ব্যাপার হল নিজেরা মৎস্যজীবি তাই আঁশ দিয়ে মায়ের মূর্তি বানানো হয় । আর পুজোর ঠিক আগের দিন দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটি সাদা কাপড়ে মায়ের পায়ের আলতা পরা একটি ছাপ পড়ে । ওটা দৈব ছাপ । কাপড়টি স্বপ্নাদেশে রাখা ছিলো । তারপর থেকে দৈব ছাপ পড়তে শুরু করে । আর ঠিক তারপরেই সন্ধি পুজো হয় ।

তাই এই অপূর্ব দৈব গ্রামে ঐ কাপালিক, জটা বাবা মায়ের নির্দেশেই এসে হাজির হন ও তপস্যায় ব্রতী হন ।

বিরাজ বৈদ্যের মেয়ে, প্রখ্যাত হবার ভূত যার মাথায় চেপেছে সে তো ট্র্যাভেল ভ্লগ করে । সে নিয়মিত নানান জায়গায় যায়- এক পুরুষ ভিডিওগ্রাফারকে নিয়ে আর সাথে থাকে তার মাসী , অবসরপ্রাপ্ত এক মধ্যবয়সী

রাজনীতিবিদ্ , তাজি নাম তার । ভদ্রমহিলা বিবাহ করেনি তবে কুমারী কিনা কেউ জানেনা । চার ফিট হাইট । গোলগাল । মাথায় অসংখ্য কোঁকড়া সবুজ চুল খোঁপা করা । কানে রূপার দুল। হাতে দামী ছেলেদের ঘড়ি । সময় সচেতন । সোনা ও হীরার চেয়ে রূপা ও তামা প্রেমী । হাতে বিশাল সব তামা ও রূপার চুড়ি । বিড়ি প্রেমী । হুঁকো প্রেমী । মদ্যপান করেনা ।

মাদকদ্রব্য নেয়না । জর্দা দেওয়া ও খয়ের ভরা পান খেয়ে মুখ লাল করে । ওর ভালোলাগে সেটা ।

আর অজস্রবার চা পান করে থাকে । এই তেজী ও তাজি নাম্নী মাসীমণিটিকে দেখতেও বহু মানুষ এই ভ্লগে আসে । তাজ্জব বনে যায় একে দেখে ! সংস্কারিও বটে । পোশাকে আশাকে । শর্ট ড্রেস ও বিভাজিকা মেলে ধরা পোশাক পরেনা । পোশাক ছিঁড়ে গেলে ফেলে দেয় । বাজার থেকে ছেঁড়া জিনিস কেনে না । মেক-আপ সীমিত । তবে কপালে বিরাট একটা টিপ্ পরতে দেখা যায় ।

এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে ভ্লগে **তাজমহল সিমেন্ট** এই নামে । যেন তাজমহল, সিমেন্টে গড়া আরকি । সংস্কারি কিন্তু একটু ক্রেজি । লোকের পছন্দ হয়েছে তাকে ও নামটি ।

ওদের ভ্লগ মূলতঃ বেড়ানো নিয়ে ও নানান অফবিট্ জায়গার কথা ছাড়াও বিভিন্ন লোকাচার , মেলা , সংস্কৃতির কথাও থাকে যার জন্য মানুষ এত লাইক দেয় ও শেয়ার করে । এক মাসের মধ্যে ওদের সদস্য সংখ্যা ৫০০০০ থেকে ৮০০০০ হয়ে গিয়েছিলো একটা সময় ।

এই জনপ্রিয় ভ্রমণ ভ্লগের নাম ভ্রমণ ওড়না ।

এদের কাজ আপাততঃ ঐ করোটির কাছে গল্প শোনা । তাজি , তুঁহু ও কুহু আর বিরাজ বৈদ্য তো আছেনই !!

ও হ্যাঁ ,একটা কথা বলা হয়নি তাহল এই যে এদের বাড়িটি খুবই মজার । এই বাড়িটি বিরাজ বৈদ্যর পত্নী নমিতা দেবীর স্বপ্নের বাসা , নাম ম্যাজিক বাড়ি আর খাসা এর গঠন শৈলী ।

চারতলা বাড়িতে বেশ পুরাতন ছাপ আছে আবার নতুনত্বের ছোঁয়াও আছে ।

একটু যেন বৌদ্ধ স্থাপত্যের ছোঁয়াও আছে এই ম্যাজিক বাসায় ।

ধবধবে সাদা রং আর মেরুন বর্ডার দেওয়া আর ছাদগুলো পর্যন্ত গাঢ় লাল বা মেরুন । বেশ মনোরম দেখতে । চারপাশে অজস্র সবুজ গাছগাছালি ও রঙীন ফুলের সমারোহ দেখে এত মন ভালো হয়ে যায় যে বলার নয় ।

আর সবুজ সবুজ ধান ক্ষেত ও লালচে মেঠোপথ ; সুরুচি ও সুকোমল এই দুটি শব্দের কথাই মনে হয় ম্যাজিক বাড়ি দেখলে । তা সে যাইহোক্ না কেন এই সুন্দর বাসায় ভয়ানক গল্পের যে আসর বসতে চলেছে তা তো আর কারো অজানা নয় । তো সেই গল্পেরই এবার আরম্ভ হোক্ । প্রথম গল্প হল এক পলিটিশিয়ানকে নিয়ে । মহিলার নাম ছিলো মরমী ঘোল । নাম মরমী হলেও

এই মহিলা ছিলো অত্যন্ত স্বার্থপর ও একরোখা । গ্রামের নাম দোমোহনা । এই গ্রামে দুই নদী রূপকানাই ও সুন্দরী এসে মিলেছে একটি জায়গায় । সেই জায়গা খুব একটা বড় নয় তবে একটু চর গোছের । সেই চর থেকেই গ্রামের শুরু তাই এখানকার নাম দোমোহনা । এই গ্রামের এক রাজনীতিবিদ্ ছিলো ঐ মহিলা, মরমী ঘোল ।

ভোটে জিতেই সে আসে । উন্নয়নের কাজ যে একেবারেই করেনি তা নয় তবে যারা তার পদলেহন করতো তাদের হয়ে কাজ করতো আর অন্যদের অনীহা করে চলতো । এবং শোনা যায় তার গুন্ডাবাহিনী ছিলো । ঠ্যাঙারে বাহিনীর নাম ছিলো ঘোলের দল ।

দোমোহনা গ্রামের পেছনে ঘন অরণ্য । সেখানে একধরণের আদিবাসী থাকে শত শত বৎসর ধরে । তাদের জীবিকা আগে ছিলো বনের সম্পদ বিকিকিনি করে জীবনধারণ করা । বর্তমানে ফরেস্ট সংক্রান্ত আইনে কড়াকড়ি এলে এদের মধ্যে অনেকে ওদের আরেকটি শাখার সঙ্গে মিলিত হয় যারা সংখ্যায় নগণ্য ছিলো আগে কিন্তু এখন বেশ দলে ভারী হয়ে গেছে । এরা জঙ্গলের অন্যদিকে বাস করে । তাদের কাজ হল পথের ধারে লুকিয়ে থাকা ও পাথর মেরে পথচারীদের আহত

করে কিংবা নিহত করে জিনিসপত্র লুটপাট করা । এই জনজাতির লোকেরা এরপরে সব ভাগাভাগি করে নেয় নিজেদের মধ্যে । অন্যপক্ষ , যারা আগে বনের সম্পদ বেচে খেতো তারা অনেকেই সরকারের দপ্তরে কাজ করে আর কেউবা কুলিগিরি ইত্যাদি করে কিন্তু কিছু বিক্ষুব্ধ মানুষ ওদের গোষ্ঠি ছেড়ে ঐ ডাকাতিয়া দলে যোগ দেয় । আর এখন পুরোপুরি তস্কর রূপে কাজ করে । এদেরই একজনের কন্যা হল মরমি ঘোল । এই মেয়েটি কিন্তু ঐ দল থেকে বার হয়ে লেখাপড়া শিখে মূলস্রোতে ফিরে আসে ।লোকমুখে শোনা যায় যে তাকে এরজন্য বহু হেনস্থা সহ্য করতে হয়েছে ।

--ডাকাতের মেয়ে , চোরের স্যাঙাৎ , ডাকাতের বৌ ইত্যাদি কটুক্তি হজম করে করে সে অত্যন্ত ব্যাথিত ।

নিজেকে এসব থেকে দূরে সরিয়ে নিতে সে তার বাবা ও মায়ের বাসা থেকে পালিয়ে যায় খুব ছোটবেলায় । তখন তার কতই বা বয়স ? ৯/১০ হবেও বা !

তারপর ওদেরই অন্য যে শাখা আছে সেখানে গিয়ে নিজের গল্প বলে ঠাঁই নেয় । শুনেছিলো যে সেখানে ওর এক নিকটজন আছে । ওর মায়ের দিকের । তাদের বাসায় যায় । এবং স্থান পায় । সেখান থেকে সরকারি

স্কুলে পড়াশোনা করে পরে রাজনীতিতে আসে যাতে করে অন্যদের সাহায্য করতে পারে । এটা হল মরমী ঘোলের দিকের গল্প ।

আর ওর অন্যতরফের লোকেরা ওকে গুন্ডা, অত্যাচারী, লোভী, স্বার্থপর এইসব বলে থাকে ।

তো ঘটনা যাইহোক্ না কেন এই মরমী ঘোলের মৃত্যু হয় অপঘাতে । মহিলার বিয়ে হয়নি । ওদেরই দলের মানে পার্টির এক নেতার সাথে লিভ-ইন রিলেশানে ছিলো ।

লোকে বলে সেই-ই নাকি মারিয়েছে ।

সেই লোকটিও নাকি আদতে গুন্ডাই ।

নাম ঢুলি। গোল গোল চোখ । ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

দেখলে ধর্ষণকারী বলে মনে হতে পারে । ভয়ও লাগতে পারে । ঢুলি চিবুরা । লোকটি পিতল, কাঁসা ও অ্যালমুনিয়ামের ব্যবসা করে ।

মরমীর মৃত্যু হয় গুলিতে । গুলি ছোঁড়ে এক পাগল । পাগলের হাতে কে বন্দুক দিয়েছে কেউ জানেনা । তদন্ত হচ্ছিলো তাই নিয়ে ।

কিন্তু শেষপর্যন্ত কেসটাই বন্ধ করে দিতে হয় কারণ আধিভৌতিক ব্যাপার ঘটে ময়নাতদন্তের সময় ।

কেন যে এমন হল তাও রহস্য ! লোকে বলে হয়ত কান টানলে মাথা চলে আসবে তাই এমন হল । ওর হত্যা নিয়ে তদন্ত হলে ওদের নানান কুকর্ম ও অপকর্মের দুয়ার খুলে যাবে তাই এমন হল কিন্তু সঠিক কেউ কিছু জানেনা ।

আসলে হলকি , চিকিৎসক হরি মোদক ঐ এলাকায় ময়নাতদন্তের দায়িত্বে ছিলেন ।

সেদিন যখন মরমীর লাশটা আনা হয় পোস্ট মর্টেমের জন্য তখন সময় অনেকটাই বয়ে গেছে ।

ইষৎ পচনও যেন ধরেছে দেহে । গ্যাল গ্যাল করছে ।

আলো জ্বালিয়ে ডাক্তার কাজে নামবেন । সহকারি রয়েছে । রয়েছে ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ।

যারা জুনিয়ার ডাক্তার , পোস্ট মর্টেম শিখতে এসেছে তারাও কজনায় জুটেছে । এমনসময় পরিত্রাহি চিৎকার !

■ আ আ আ আ আ ঈ ঈ ঈ ঈ ঈ ই র ক্ !!

সবাই যে যার মুখ দেখছে । আর চিকিৎসক হরি মোদক মাটিতে লুটাচ্ছেন ।

ওনাকে টেনে তুলতে হল । চেয়ারে বসাতেই উনি বললেন , লাশটা দেখে এসো, দেখে এসো, যাও সবাই !

দু , একজন দৌড়ে গেলো এবং তাদেরও ভিরমি খাবার অবস্থা ! কি দেখছে তারা ? দেখেছে তারা সকলে ?

হ্যাঁ ? দেখেছে যে ঐ যে লাশ যার পোস্ট মর্টেম হবার কথা সেই পলিটিশিয়ান শ্রীমতী মরমী ঘোল এর লাশের বদলে ওদের প্রত্যেকের/ নিজের লাশ শোয়ানো ঐ টেবিলে ! এবং একবার নয় বারবার তারা এই দৃশ্য প্রতক্ষ্য করে । সবাই ভয় পেয়ে যায় ।

এরপরে বড় ডাক্তারবাবুকে জানানো হয় আর বড়সড় নেতাদের । সবাই, বড় ডাক্তারবাবুকে স্বয়ং এসে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করে এবং তিনিও একই জিনিস দেখতে পান । লাশকাটা ঘরে ; রাজনৈতিক নেত্রীর মৃতদেহের বদলে বড় ডাক্তারবাবুর বডি শোয়ানো ময়নাতদন্তের টেবিলে । আর প্রতিবারই দেখা যায়

ভয়ানক তাদের মুখ ও দেহের গঠন হয়ে উঠেছে ,তারা আর কেউই ঐ চত্বরে যেতে রাজি হয়না ।

শেষকালে নেতারা সবাই গোলটেবিল বৈঠক বসান ও স্থির করেন যে ময়না তদন্ত না করেই লাশকে সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হোক্ ও ব্যাপারটা কোনোভাবে ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হোক্ । সেরকমই হয় , যেমন কথা সেরকম কাজ ।

কিন্তু এখানেই সব শেষ নয় । এই মহিলা যেই জনজাতির তারা মারা গেলে কবর দেয় । অনেকদিন বাদে ঐ মহিলার কবর খুঁড়ে বার করা হয় হাড়গোড় । হয়ত কোনো বিশেষ কারণ হবে তা কেউ জানেনা । কারণ তা বার করে ওর পরিবার । কিন্তু কবর খুঁড়লেও সেখানে কিছু মেলেনা ;মাটি ব্যাতীত । পরে এইসব নিয়ে পুলিশ বিশদ তদন্ত করে । তাতে নাকি বার হয় যে লাশ চোরেরা ঐ লাশ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো অনেক আগে । এরা এগুলি করে সাধনার জন্য । নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য ও কখনো কখনো নানান মানসিক কদর্যতার কারণেও । কেউ কেউ লাশ ভক্ষণ করে কেউবা লাশের সাথে সঙ্গম করে থাকে ।

এই গল্প শুনে যা বুঝলো কুহু , তুঁহু , তাজি এরা তাহল যে মরমী যার নাম সে জীবিত থাকতেও যেমন সেরকম মৃত্যুর পরেও মরমে মরমে মরেই গেলো । একটুও শান্তি পেলো না কখনো । যদিও তার বিরুদ্ধে করা অনুযোগগুলি প্রমাণিত হয়নি কখনো ।

ডাকাতিয়া লোকগুলোর শিশুদের পড়ানোর জন্য বিদ্যালয় করে দিয়েছিলো ফ্রিতে যদিও লোকে বলে ওরা পড়ে কি করবে? বড় হয়ে তো ডাকাতই হবে ! ওদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও করে দেয় । তাতেও লোকে বলে , ডাকাতের আবার ডাক্তার লাগে নাকি ? ওরা তো মানুষ মারে !

অনেক সভ্য সমাজের লোক ডাকাতের শিশুদের গলা কেটে মেরে ফেলতো । কারণ বড় হয়ে তো ডাকাতই হবে ! তাইনা ? যেন ডাকাত কোনো শীলমোহর । রবার স্ট্যাম্পের মতন কিনতে পাওয়া যায় । এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে রক্ত বয়ে চলেছে তাকে বাল্মিকী করার কোনো চেষ্টা কেউ করেনি কখনো ।

ডাকাতে কালীমন্দিরও করে দেয় একটা । সেখানে একজন শিক্ষিত পুরোহিত ছিলো ওরই কৃপায় ; যিনি ডাকাতদের উত্তরণ শেখাতো ।

তাতেও লোকে গালি দেয় ,

সব রত্নাকর , বাল্মিকী হয়না !

কাজে কাজেই ।

তুঁহুর মনে হল এই কথা , **ম্যানিফেস্ট রেজারেকশান !**

আর কুহু, করোটিকে প্রশ্ন করে বসলো ,

তোমার এই হাল কেন গো ? কোন তান্ত্রিক নাকি মায়াবলে তোমায় কায়দা করে মারে ! আইনের প্যাঁচ এড়াতে ? কি সেই গল্প ? বলোতো শুনি !

খুলি বলে চলে , ঐ মহিলা ভৈরবীর নির্দেশে আমি আমার মঙ্গল হবে বলে একদিন রিক্সা ভ্যান ডেকে ;শ্মশান থেকে একটি মড়ার খাট ও জাজিম আনি বাড়িতে । আর তাতে রোজ শুতাম ,এতে নাকি আমার জীবনের সমস্ত বাধা কেটে যাবে এরকমই বলে সেই মহিলা তান্ত্রিক । তাই আমি ওতেই আবার বসে বসে খাওয়া দাওয়া ও টিভি দেখাও করতাম । সেই খাটই আমার প্রাণ নেয়। যার খাট তার ঠিকুজি কুষ্ঠি তো নিতে যাইনি ! কোনো খুনি টুনি ছিলো হয়ত ; আমার জীবনদীপও নিভিয়ে দিলো !

আর কাপালিক মহিলাও আইনের হাত থেকে বেঁচে গেলো আমাকে মেরে কারণ কোনো প্রমাণ নেই আর আইন প্রমাণ চায় । তারপর আমার দেহের হাড়গুলো আর খুলি নিয়েই সাধনা করতে লাগলো । পরে অন্য কাপালিক বাবা আমার খুলিটি রক্ষা করেন । আমার মনে হয় আইনের এই অন্ধ প্রমাণের ওপরে ভরসা ব্যাপারটা বদলানো উচিৎ । প্রমাণের সাথে সাথে আরো অন্য অনেক কিছুও দেখা উচিৎ আর এইসব কাপালিকদের জন্যও কড়া আইন করা উচিৎ নাহলে ওরা মানুষ মেরে পার পেয়ে যাচ্ছে । আর মানুষ কেন আজকাল তো বাঘ, হরিণ , সিংহ এসব মারাও অনেক অনেক দেশে নিষিদ্ধ । কাজেই কাউকেই মারা চলবে না আইনের বিরুদ্ধে যা তাদের । যে করবে সে সাজা পাবে তা অস্ত্র, শস্ত্র কিংবা তন্ত্র ও মন্ত্র যাই ব্যবহার করুক না কেন ।

ঠিক বলেছো । বলে কথা শেষ করে ওরা ।

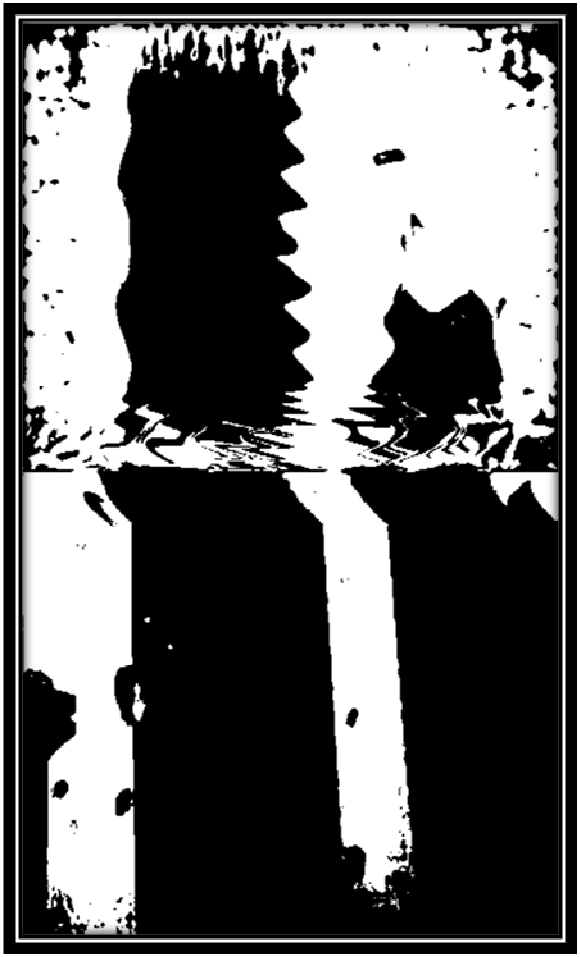

এবারের গল্প হল বাঁকুড়ার রাজগ্রামের । এই গ্রামে, তন্তুবায় সম্প্রদায় এক আজব ধরণের দুর্গাপুজো করে থাকে । তাহল তারা কেবল দুর্গার মস্তকের পুজো করে । বহু যুগ ধরে এই পুজো চলে আসছে । এই গ্রামের মানুষ নিজেরাই প্রতি পুজোর পর থেকে পয়সা জমিয়ে পরের পুজো করে থাকে । আগে এখানে তৈরি গামছার খুব নাম ছিলো । আজকাল তো আর তাঁতের তেমন চল নেই ! মেশিনে সব হয় । আর ধীরে ধীরে বিটস্ আর বাইট্সে চলে আসছে সব । তাই এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা বেঁচে আছে খুবই কষ্টে । সরকার থেকেও বিশেষ কিছু করা হয়না কারণ ভারতের মতন দেশে মেশিন ও মানুষের মধ্যে ভাবসাব আজকাল বেশ হলেও মোবাইলের কারণে , বাস্তব জীবনে তাদের মধ্যে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে । তাই এই হাতে বোনা তাঁতিরা অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে । তবুও তারা অর্থ সঞ্চয় করে করে দুর্গা পুজো করেই চলেছে শতাব্দী ধরে । এখানেও সরকারি চাঁদা কিংবা অন্যান্য কোনো সংস্থা থেকে মোটা অর্থ আসেনা । কিংবা কোনো বনেদী জমিদার তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননা এইসব তথাকথিত **ছোটলোকদের !!**

এইসব তন্তুবায় মানুষদের তার হয়ত দরকারও নেই !

কারণ কথায় বলে যার কেউ নেই তার ঈশ্বর আছেন । কথাটা যে কতটা সত্য তার প্রমাণ মেলে এই গল্প শুনলে । এই গ্রামে সম্প্রতি এক দানবের তান্ডব শুরু হয় । আজকাল ভিডিওর যুগ । কতনা মানুষ গল্পের লোভে ছড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক । সেরকমই কিছু মানুষের জন্য এই গ্রাম জনপ্রিয়তা পায় । তারপর সেই দানবের আবির্ভাব হয় । দানবের পরিবার হল নেতা গোছের আর সব মানুষই যুক্ত রাজনৈতিক দলের সাথে । তবে তারা আগে ছিলো গুন্ডা । পরে পার্টিতে এসেছে ।

নামও আজব সবার । লাল গুন্ডা, নীল গুন্ডা, সবুজ গুন্ডা, খয়েরি গুন্ডা, সাদা গুন্ডা, আর কালো গুন্ডী ।

এই কালো গুন্ডী হল একমাত্র মেয়েমানুষ এই দলে ।

আর চেহারা ভয়ংকর । মোটা , খুব ফর্সা , কোঁকড়ানো কেশ ও বিরাট লাল টিপ কপালে আর নাকে নথ ।

এরা এসেই এই গ্রামের সব পুজোয় থাবা বসাতে শুরু করে । কারণ প্রচার পাবার সাথে সাথে বহু মানুষ ও পর্যটক এখানে আসতে শুরু করে এবং এই গ্রাম রীতিমতন একটি টুরিস্ট স্পট হয়ে ওঠে । তাই বেড়ে ওঠে হোটেল, আবাসন । খাবার দোকান । ফুলের দোকান ইত্যাদি । এবার এই গুন্ডার দল এসে সব কটা

পুজোর দখল নিয়ে মন্দির স্থাপন করে এগুলোকে বার্ষিক না করে নিত্যকালীন করতে চায় ও তিরুপতি বা কালীঘাটের মতন একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে । কিন্তু তন্তুবায় সম্প্রদায় তাতে রাজি হয়না । তার কারণ প্রথমতঃ এটি তাদের পিতৃপুরুষের সাথে যুক্ত একটি ব্যাপার , ব্যবসা নয় আর দ্বিতীয়তঃ একে তারা আবেগমন্ডিত বলে মনে করে । বাইরের লোকের কাছে বিক্রি করতে চায়না । তখনই বাঁধে গোলযোগ । আর গুন্ডা দলের সাথে ক্রমাগত সংঘর্ষে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে শুরু করে তন্তুবায় সম্প্রদায় ।

ঠিক তখনই , হ্যাঁ ঠিক তখনই এক যোগিনী কোথা থেকে যেন হাজির হন একদিন ।

--সেদিন ছিলো অমাবস্যা । ঘোর অন্ধকার । আকাশে বাঁকা চাঁদও নেই । আমি চলেছি কুঁয়ো পাড়ে । জল আনতে । বলে ওঠে বৃদ্ধ তাঁতি হরিহর ; হঠাৎ দেখি এক কালোবরণ মেয়েলোক কোথা থেকে যেন ভুঁই ফুঁড়ে উঠে এলো । প্রথমটায় আমি ঘাবড়ে যাই ! পরে একটু ধাতস্থ হই ওরই গলার স্বরে : ওহে , ও কাকা , বলি এই গ্রামে একটু ঠাঁই পাবো ?

আমি অবাক হয়ে দেখছি । এই মেয়েকে আগে কোনোদিন দেখিনি । যুবতী মেয়ে , একে কোথায় আমি জায়গা দেবো ? তাই জিজ্ঞেস করলাম , মা তুমি কোথা থেকে এসেছো , এত রাতে কোথায় যাবে ?

মেয়েটি লাজুক মুখে বললে , কাকা, আমি এক পুজারিনী । মন্দিরে মন্দিরে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই । শুনেছি তোমাদের গ্রামে দুর্গাদেবীর পুজো হয় প্রাচীনকাল থেকে আর কেবল মুখমন্ডলের পুজো হয় । আমি সেটাই দেখতে এসেছি । পুজো হয়ে গেলে আমি চলে যাবো ।

শুনে মনে করলাম, হবেও বা ! কতনা মানুষই তো এসেছে ভিডিও দেখে দেখে । মারদাঙ্গাও হল । আর এই মেয়েটি তো ভক্তিমতী ! তা আহা , বাছা থাকুক এখানেই । তবে আজ রাতে ও মন্দিরে থাকুক । কাল গ্রামের মোড়লকে বলে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবেখন । তাই মুখে ওকে বললাম, ঠিক আছে মা, তুমি আমার সাথে এসো । আজ অনেক রাত হল। তুমি মন্দিরে থাকো । কাল সকালে গাঁয়ের প্রধানের বাসায় তোমায় নিয়ে যাবো ।

যেমন কথা তেমন কাজ । মেয়েটি মন্দিরে গিয়ে তার চাতালে বেশ গুছিয়ে বসলো । বেশি কিছু নেই । একটা

পুঁটুলি । একটি মাঝারি লাঠি আর জল পান করার জন্য বোধকরি একটি ঘটি ।

বেশ গুছিয়ে বসলো । আমি মাদুর পেতে দিলাম । তারপর অল্প কথা বলে চলে গেলাম ।

পরেরদিন সকাল থেকে পুরোহিতের সাথে বেশ ভাব জমে যায় মেয়েটির । পরে গ্রামের মোড়লও ও তার পরিবারও মেয়েটিকে খুব পছন্দ করে বসে । কিছু একটা ছিলো ওর মধ্যে । যেই দেখতো আকর্ষিত হতো ।

অসম্ভব কালো এই মেয়েটির কিন্তু মুখশ্রী খুব সুন্দর ছিলো একদম দুর্গা প্রতিমার মতন ! ঘন কালো চুল আর ছিপছিপে গড়ন । সে আসার পর থেকে মন্দিরের প্রসাদ তাকে দিয়েই রান্না করাতে লাগলো পুরুৎ মশাই । কেন কেউ জানেনা । আর প্রসাদের স্বাদ অপূর্ব !

আগেও তো লোকে প্রসাদ খেয়েছে !

মেয়েটি কারো কপালে হাতে দিলে তার ব্যামো সেরে যেতো তা সে যতই কঠিন রোগ হক না কেন !

এইভাবে ক্রমশ সে রাজগ্রামের রাজরাণী হয়ে উঠলো !

লোকেরা বলে যে সেই মেয়েটি আসার পর থেকে গ্রামের ভাগ্য যেন খুলে যায় । অনেক দিকে উন্নতি হতে শুরু করে । অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় । যেন গৃহলক্ষ্মীর পদচিহ্ন পড়েছে এই গ্রামে !

কোনো কোনো রমণী সংসার ধ্বংস করে দেয় আবার কেউ কেউ কমলা , সংসার গড়ে তোলে স্বর্ণকমলের স্পর্শে । এও সেরকমই একজন ।

আগে যে লাল, নীল, সবুজ , খয়েরি গুন্ডার দল আসে এই গ্রাম এর দখল নিতে ও তাদের মাতাজী খোদ তন্ত্রমন্ত্রের জাদুকরী কালো গুন্ডী , লোকে বলে যার সহচরী মানুষ নয় ডাকিনী ও প্রেতিনী আর এর সমাজে নয় শ্মশানে বাস করা উচিৎ সেই কালো গুন্ডীও ধীরে ধীরে এই মেয়েটির ভক্ত হয়ে যায় । কালো গুন্ডী অনেক তুকতাক জানে ও লোকের ক্ষতিসাধনে ব্রতী ছিলো । **কিন্তু তাকে এই সাধ্বী বলেছিলো , যেই বিদ্যা মানুষ ও অন্যান্য জীবের আধ্যাত্মিক ক্ষতি করে, তাকে বিদ্যা বলেনা ।আর প্রকৃতি তাকে কোনোদিনই মেনে নেয়না ।**

আর তারা তখন সবাই একেই তাদের গুরুমা বলে মেনে নেয় ।

বলে ওঠে সবাই একসুরে , আমাদের এসবের থেকে ভালো কোনো উপায়ে জীবন যাপন করার কথা জানা নেই । তুমি আমাদের যেই বিষ দিয়েছো ,আমরা সবাই সমাজে সেই বিষই ঢেলে চলেছি ক্রমাগত , তাই এবার আমাদের মুক্তি দাও মা !

মা বলে ডাকলেও ,এই মেয়েটি কিন্তু কারো গুরু টুরু নয় ।সে হল এক যোগিনী যে কেবলমাত্র তীর্থে তীর্থে , মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়ায় । কোথাও একবারে বেশিদিন থাকে না । ঘুরে ঘুরে আসে ।কখনো কখনো । হঠাৎ করে । নাও আসতে পারে জীবনে আর কোনোদিন । কখনো । কোথাও ; এমনই মহিলা এই সাধিকা ।

কেউ নাকি একবার একে দেখেছে অনেক রাতে , সেদিন ছিলো ভূত চতুর্দশীর রাত ; একটি বিরাট পেতলের চোদ্দ প্রদীপ হয়ে আকাশে উড়ে উড়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছে আবার নেমে আসছে মেয়ে হয়ে । আবার উড়ে উড়ে ভেসে ভেসে যাচ্ছে । চোদ্দ প্রদীপ হয়ে । নেমে আসছে মেয়ে হয়ে । আর প্রদীপগুলো সব জ্বলছে ! চমৎকার দৃশ্য !

গায়ে কাঁটা দেয় । অপার্থিব , অবিনশ্বর এই বায়াস্কোপ দেখে ।

গাঁয়ের লোকেরা এর একটি নাম দিয়েছে । এত্তো সুন্দর , সুললিত মেয়ের নাম না দিয়ে পারা যায় ?

শুভঙ্করী । কি সুন্দর তব নামখানি !

শুভ-হোক্ সব শুভঙ্করী !

এই মেয়েই একদিন হাওয়া হয়ে গেলো । যেমন করে ভুঁই ফুঁড়ে বার হয়েছিলো ঠিক সেইভাবেই একদিন অদৃশ্য হয়ে যায় , শুভঙ্করী !

কিন্তু গেলো কোথায় ?

কেউ জানেনা ।

আর এসেছিলো কি ?

অন্ততঃ শুভঙ্করী আর আসেনি ।

তাহলে কে এসেছিলো ?

সুগৌরী ।

সেটা আবার কে ?

কেউ জানেনা সে কে । তবে সেও একইরকম দেখতে যেন শুভঙ্করী আর সুগৌরী দুই যমজ বোন । কেবল সুগৌরী তার নামের মতনই বেজায় ফর্সা ।

তার আচার, ব্যবহার , চোখ, নাক, মুখ এমনকি কথা বলার ধরণও অবিকল শুভঙ্করীর মতন । কেবল গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণের বদলে অত্যন্ত সাদা। সোনার মতন বলা ভালো । যখন এই নারীর আবির্ভাব হয় এই গ্রামে তখন সেখানে বিরাজমান মহাশান্তি ।নতুন এক রাজনেতা এসেছেন । উনি তন্তুবায় সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু সুশিক্ষিত । তাই এমন সব কলকব্জা বসিয়েছেন গ্রামে যে তাঁতিদের অনেক সুবিধে হয়েছে , গামছা দিয়ে তারা আজকাল ডিজাইনার পোষাক তৈরি করছেন বাংলাদেশের ফ্যাশান শিল্পী বিবি রাসেলের মতন- আরো নতুন নতুন ভাবে এবং বহু নতুন কিছু হচ্ছে যা অভাবনীয় ছিলো এতদিন । এসবই সম্ভব হয়েছে কারণ অনেক **এন জি ও** তাদের কলাকে মেলে ধরেছে বিশ্ব মেলায় । ইলেকট্রনিক হাটেবাটের মাধ্যমে । ঐ যে বললাম , কেউ কেউ সংসার ভাঙে আবার কেউ কেউ গড়ে ! সমরক্ষেত্র থেকেও তো গজিয়ে ওঠে মানব আবাসন । সবুজ ঘাসের মুকুল !

কালো গুন্ডীর মতন মাতাজীরা সংসার ভাঙে আর শুভঙ্করীরা গড়ে তোলে । তাইতো আজ সুগৌরীর পদচিহ্ন পড়তেই মহাশান্তির পারাবার এসে আছড়ে পড়ছে চারপাশে আর মানুষ খুশিতে উপছে পড়ছে । তবে একদিন শুভঙ্করীর মত এই সুগৌরীও লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় ।

সেটা ঠিক দুর্গা পূজার আগে আগে । কেন তা কেউ জানেনা সঠিক । তবে বলে যায় যে তার কাজ ফুরিয়েছে তাই যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফিরে যাচ্ছে ।

XXXXXXXXX

নবদুর্গার মধ্যে এক মা আছেন কালরাত্রি । আর তার পরের রূপ মহাগৌরী । এদের গল্পটা ; অল্প হলেও নাকি

কিছুটা মিলে যায় শুভঙ্করী আর সুগৌরী এই দুই মেয়ের সাথে । আশ্চর্য হতে হয় , তাইনা ?

এবারের কাহিনী হল এক মানুষকে নিয়ে যিনি পেশায় হলেন এক সংরক্ষণ বিজ্ঞানী । উনি কাজ করতেন ভারতের মূল ভূখন্ডে । কিন্তু কি করে কে জানে একদিন উনি এসে পৌঁছান শ্রীখোলাতে ।

এই গ্রাম হল সমুদ্রর ধারে এক গ্রাম- যার দূরত্ব অনেক বেশী চেন্নাই থেকে । প্রায় ভারতের শেষভাগে এই গ্রাম । এখানে যেসব মানুষ বাস করে তাদের কাজ হল আশেপাশের পাহাড় থেকে পাথর কেটে তা দিয়ে নানান বস্তু তৈরি করা এবং লোহালক্করের কাজ করা । মূলত: লোহার কাজই বেশি হয় এখানে । আর পাথরের নানান জিনিসপত্র যেমন হামান দিস্তা , ঠাকুরের আসন , জুতোর

র‍্যাক , বাটি, থালা , গেলাস, মূর্তি, গহনা এসবও তৈরি হয় । সে যাইহোক্ এখানকার হস্তশিল্প/ লৌহকর্মের জন্য ও পাথরের কাজের জন্য লোকে এদের নাম দিয়েছে বিশ্বকর্মা মানুষ আর গ্রামকে বলা হয় বিশ্বকর্মাদের গ্রাম ।এখানে নাকি অনেক আগে এক বিশালদেহী মানুষ বাস করতেন যিনি খুবই বলশালী হবার সাথে সাথে এইসমস্ত কাজে পটু ছিলেন । তিনিই গ্রামবাসীকে এইসব কাজে নিযুক্ত করে গেছেন । তার আগে এরা ক্ষেতখামার করতো এবং রুক্ষ্ম মাটি ও মিষ্ট জলের অভাবে চাষবাস ভালো হতোনা ;অনাহারে বহু মানুষের মৃত্যু লেগেই থাকতো । পরে এই মহামানবের জন্ম হয় এই গ্রামে যিনি এদের এইসব হাতের কাজ শিখিয়ে নতুন দিশা দেখান । পরে সরকার পক্ষ থেকেও বহু সাহায্য আসে আর মানুষগুনো ফুলে ফেঁপে ওঠে । এই বিশেষ ব্যাক্তিকে লোকে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মার রূপ বলেই মনে করে এবং বড় পাথরের মূর্তি করে, সম্মান দিয়ে গ্রামের ফটকের সামনে রেখেছে ।

এই কারিগরদের গ্রামে অকস্মাৎ এক পন্ডিতের আবির্ভাব হলো খুবই রহস্যজনক ভাবে । নাম তার শ্রীহট্ট হর্ষ ।

লোকটি সংরক্ষণ বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে ।

বয়স ৫০ এর অনেক বেশী । **ডক্টরেট । দুটি ডক্টরেট আছে । আবহবিজ্ঞান আর বন বিজ্ঞানে ।**

লোকটি সারাটাদিন বনে গিয়ে বসে থাকে । তাই তার নাম দিয়েছে লোকে বনমালী । পাখির কুহুতান রেকর্ড করে । ঝোরার শব্দ এমনকি রাত্রে শেঁয়ালের ডাকও রেকর্ড করে নিয়ে আসে । ঝিঁঝিঁর ডাক , বনমোরোগের ডাক এসবই তার ভালোলাগে ।

এসবই তার মনে আছে কিন্তু কোথা থেকে এসেছে তা আর মনে করতে পারেনা ।

কিছুতেই মনে পড়েনা । তাই এখন এই গ্রাম, শ্রীখোলাতেই বাস । সারাদিন এখানেই পাহাড়ে ও অরণ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় । আন্তর্জালে বসে নানান ওয়েবসাইটে ছবি , পশুপাখি সাইটিং , শব্দ এইসব আপলোড করে । ইউ-টিউব চ্যানেল খুলেছে যা বেশ জনপ্রিয় । সেসব থেকে রোজগার হয় । আর স্থানীয় এক নারীকে বিবাহ করেছে । তার পৈত্রিক সম্পত্তি আছে । সেই নারী ছিলো স্বামীহীনা । দুজনের ভালই মিল হয়েছে । সেই নারী অবশ্যি অবলা নয় । তার পূর্ব স্বামীর ব্যবসা চালায় । পাথরের ব্যবসা । লোহার ব্যবসা । আর একটি পুত্র আছে

। আগের পক্ষের । সে এখন সংরক্ষণ বিজ্ঞানী হতে ইচ্ছুক !

বিশ্বকর্মার দরবার তাকে আর আকর্ষণ করেনা ।

আর এইভাবেই বুঝি ঢুকে পড়ে বিবর্তনের সুঁই , একটু সুক্ষ্ম ছেদ করে, পশমের মধ্যে দিয়ে !

কিন্তু এরমধ্যে, এই গপ্পের ভেতরে অপ্রাকৃত কী আছে ?

আছে , আছে -ভাই একটু ধৈর্য্য ধরে শোনো তবে !

শ্রীহট্ট হর্ষ তো এখানে একা আসে আর সব ভুলে যায় কেবল কিছু জিনিস ছাড়া । আর আসেও আজব উপায়ে । একটি নৌকোতে ভেসে আসে ।

সেটা চরায় এসে আটকে যায় ।

তাতে অজস্র ছিদ্র । আর এই একজনই মানুষ । যিনি জীবিত । আর দুজন মৃত আর দুটি কঙ্কাল ।

শ্রীহট্ট হর্ষ এই লোকটির সাথে কোনো জিনিসপত্র ছিলোনা । তাকে পায় ভোরের কিছু মেছো যারা মাছ ধরতে যায় । এরপর থেকে ঐ জায়গার নাম হয়ে যায় হেঁয়ালি চরা ।

এখন ওটা ভ্রামণিকদের জায়গা ।

শ্রীহট্ট হর্ষ অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে বলে যে সে এটাও মনে করতে পারেনা যে কেন কেউ মৃত আর কেউ কঙ্কাল !

তবে তারা ঐ নৌকোতে মোট ৫জনই ছিলো ।

কোথা থেকে আসছিলো আর কেন সেগুলো পর্যন্ত ধোঁয়াশা ! লোকটির যখন শেষদিকে জ্ঞান ছিলো এই অবস্থায় সব দেখতে পায় তখন সবাই জীবিতই ছিলো আর হঠাৎই কোনো উথাল পাতাল শুরু হয় আর লোকটি জ্ঞান হারায় । হুঁশ আসলে তারপর দেখে কেউ যেন তাকে নৌকো থেকে ছুঁড়ে এই চরায় ফেলে দিলো । তারপর কিছু মনে করতে পারেনা ।

আবার যখন জ্ঞান আসে তখন সাথীদের দেখতে পায়না । কিন্তু দেখে একটি অদ্ভুত নীলচে আলো অনেকটা হ্যালোজেন আলোর মতন ; একটি মায়াবী কোনো মানবীর আকার নিচ্ছে আর তার দিকে এগিয়ে আসছে । তারপর শ্রীহট্টের নিজেকে ভীষণ হাল্কা মনে হতে শুরু করে । তারপর দেখে দেহের সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে আর এক সুন্দর ঘুমের রেশ এসে দুই চোখকে ঢেকে দিয়েছে ।

বাকিটা আর মনে নেই ।

পরের ঘটনা ইতিহাস । এই গ্রামের মানুষ তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে যায় । সেখানেই সব দেখা হয় । রক্তচাপ , হৃদয়ের ওঠানামা সমস্ত তারপর তাকে মানুষের কাছে ফেরৎ দেওয়া হয় । এরপরে এই গ্রামের প্রধানের নির্দেশে ওদের উপপ্রধাণের বাসায় তাকে রাখা হয় । উনি একজন সমাজসেবকও বটে । লোহালক্করের মাঝে থেকেও হৃৎপিন্ডের অনেকটাই আজও কোমলতায় ভরা । তারই ওখানে হবু পত্নীর সাথে পরিচয় ও পরে পরিণয় ।

আসলে শ্রীহট্ট হর্ষকে দেখতে ভারি অমায়িক ও সুপুরুষ । অনেকটা ঋষিদের মতন । আর তার চালচলন ও কথা বলার ভঙ্গিমাও এত সুন্দর যে মনে গেঁথে যায় এই মানুষটি সহজেই । আর মুখ খুললেই যেন পান্ডিত্য ও প্রজ্ঞা ঝরে ঝরে পড়ে । লোকটি অত্যন্ত সুবক্তা । তাই অচিরেই সবার ভালোলেগে যায় ।শুধু এর গোঁড়ার ইতিহাস মানে এমন একজন গুণী মানব সন্তানের সবটা যদি জানা সম্ভব হতো !

হেঁয়ালি চরায় পাওয়া এই পন্ডিতের পান্ডিত্য না হলেও জীবনের গল্প আজও প্রহেলিকা হয়ে রয়ে গেছে ।

এবারের গল্পটা - তুঁহু আর ওর ভ্লগের লোকের শোনা । এটা এখানে উল্লেখ না করে ওরা পারলো না । তাজিই বলে ওঠে : : সেবারে আমরা ভ্লগ করতে গিয়েছি একটি বনজ এলাকায় । নাম গুলাবনগর । বিহার আর মধ্যপ্রদেশ বর্ডারের কাছে । জঙ্গল আছে , আছে নদী ও ঝর্ণা । খুবই সুন্দর । এখন তো বিহার আর মধ্যপ্রদেশ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । ছত্তিশগড় আর ঝাড়খন্ড কিন্তু গুলাবনগরের লোকে এখনও মনে করে ওরা আদি এলাকায় আছে । কাগজে ওসব লেখে । আমি আবার ভূগোলেতে গোল । ভুল হতেও পারে তবে গপ্পোটা আসল ।

এইটুকু বলেই একটা বিড়ি ধরিয়ে নেয় ছোট্ট করে তুঁহুর মাসিমণি তাজি । ফু ফু করে ধোঁয়া ছেড়ে বলে ওঠে আবার নিজ গতিতে : : **ততদিনে আমাদের সদস্যসংখ্যা এক লাখ হয়ে গেছে । বেশ জনপ্রিয় আমরা ।**

এবারে তুঁহু একটু চিমটি কেটে বলে , আর আমরাও ফ্রান্স আর বিহারের বর্ডারে গুলাবনগরে গেছি সেবার ।

এই অপরূপ জায়গায় গিয়ে যে আমরা ভূতের কবলে পড়বো ভাবিনি । আদতে আমরা নয় পড়েছিলো অন্য একজন ।

তাজি অর্থাৎ তাজমহল সিমেন্ট মায়াময় হাসি দেয় একখানি । তারপর স্নেহ বিগলিত হয়ে বলে ওঠে,

কিন্তু আমরা সেই বাসায় ছিলাম যেখানে ঐ মেয়েটিও ছিলো । আমরা এক হোম স্টেতে উঠি । নাম অজয় ভিলা । সেই অজয় ভিলাতেই একটি মেয়ে ছিলো তার নাম প্রীত সিং । সেই প্রীত সিং এর পতিদেব আর্মিতে কাজ করতো । এই বাড়িটি ছিলো তাদের পৈত্রিক বাড়ি । শ্বশুর, শাশুড়ি ও একটি দেওরের সাথে এখানে প্রীত বাস করতো ।একদিন তার স্বামীর দেহ কফিনে ভরে সেনাবাহিনী বাসায় পাঠায় । গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছে । এই দু:খ সহ্য করতে না পেরে প্রীত, নিজের ওড়না , গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে যায় । কিন্তু সময় মতন পরিবারের মানুষের চোখে পড়ে যাওয়াতে সেই যাত্রায় প্রাণ ফিরে পায় । কিন্তু তারই মাসকয়েক পরে তাকে ওদের বাড়ির বাগানে অনেক রাতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় । এই মৃত্যুর কারণ হিসেবে চিকিৎসক বলেন যে চমচমি সর্পের ছোবল হল এর একমাত্র কারণ । অর্থাৎ সেই নিজেকে শেষ করে দিয়েছে

গভীর রাতে বৃক্ষাদির আশেপাশে ঘুরে । এটা তো নিজেকে বলি দেওয়াই হল । বিমর্ষ থাকতো হরদম । আর এই সাপের বিষের কোনো অ্যান্টিডোট নেই । তাই ওকে খুঁজে পেলেও কোনো লাভ হয়তবা হতো না ।

এই সাপের নাম চমচমি , বাংলাতে কারণ এর বিষ থেকে নাকি খুব মিহি একটা মিষ্টি সুগন্ধ বার হয় এবং এর স্বাদ এতই মিঠেল যে পিপীলিকা এইসব ভক্ষণ করে সাথে সাথে মারা যায় । এই সর্পের বিষ এক বিন্দু দেহে গেলে বলবান ১৫০জন মানুষ মারা যেতে পারে । এমনই এর প্রভাব মানুষের দেহে । রহস্যজনক এই সর্প একটা সময় বিজ্ঞানিরা প্রায় ১২০ বছর ভারতবর্ষে কোথাও খুঁজে পায়নি । এখন আবার দেখা যায় । এরা এতই চুপিসারে চলে যে কামড়ের সময়ও টের পাওয়া ভার । মশার কামড় মনে হতে পারে । বিষ দ্রুত ছড়ায় । রক্তের মাধ্যমে ।

আমরা ওখানে ভ্লগ করতে গিয়ে দেখি যে সেখানে একটি অপূর্ব গুরুদ্বোয়ার রয়েছে । তাই তুঁহু ও আমি স্থির করি যে ওটার একটি ট্যুর করবো । কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে হলে মাথা ঢাকতে হবে । তুঁহুর মাথায় তো ওর হুডির টুপিটা ছিলো কিন্তু আমার কিছু ছিলোনা । তখন ঐ হোম স্টে থেকে ওদের লোক বললো যে এই

একদিনের জন্য আর কি কিনবেন ? এই ওড়নাটি নিয়ে যান ।এটা এখানে পড়েই আছে ।

আর হ্যাঁ, বলা হয়নি, ওরা বাড়িটি পরে বিক্রি করে চলে যায় কারণ ওদের ছেলে ও বৌমা ওখানে থাকার সময় মারা যাওয়াতে ওরা হয়ত একটু মুষড়ে পড়ে । এবার আমি তো ওড়নাটি নিয়ে মাথা ঢেকে যাই । তখন কিছু ভাবিনি । কিন্তু ঘুরে আসবার পর থেকেই না আমার কি যে হয় কেবল আত্মহত্যার কথা মনে আসতে থাকে । কেন তা কে জানে ! কেবলই মনে হতে থাকে যে আমি একজন ফেলড্ মানুষ । আমার জীবিত থাকার কোনো অধিকার নেই । আমার মরে যাওয়াই ভালো । এমন আজব চিন্তা মাথায় আসাতে আমি খুবই অবাক হই । শেষমেশ বন্ধুদের সাথে আলোচনা করি । ওরা আমাকে নানান প্রশ্ন করে ঐ আত্মহত্যার কথা জানতে পারে এবং এক ফকিরের কাছে নিয়ে যায় । ভদ্রলোক এক মসজিদে বসতেন, কাশেম নাম তার । কাশেম ভাই । **র চা খেতেন** । তাতে কিসব মিশিয়ে খেতেন । সেই ভদ্রলোক আমাকে কিছু শিকড় বাকড় দেন । তাই দিয়ে আমি একটি বড় ব্রেসলেট বানিয়ে , আদতে উনি মাদুলি করে পরতে বলেন কিন্তু আমি মাদুলি পরবো না তাই ওনাকে জিজ্ঞেস করতে উনি বলেন যে শরীরের সাথে টাচ্ করলেই হবে

তাই ব্রেসলেট বানিয়ে পরি । সেইটা পরে থাকি পাক্কা এক বছর । তারপর আমার এইসব চিন্তা দূর হয় ।

পরে কাশেম ভাই বলেন যে আমাকে জ্বীনে ধরেছিলো । আর ওটা হল ঐ মেয়েকে যেই জ্বীনে ধরেছিলো যার জন্য প্রীত সিং আত্মঘাতী হয় সেই একই জ্বীন ।

হয়ত ওদের বাড়ি বনের ধারে ছিলো আর সেখানে কোনো জ্বীন আগে থেকেই বাস করতো ! মুসলিমরা প্রেত-আত্মাকে জ্বীন বলে । বনে অনেক আলো জ্বলতো সন্ধ্যের পরে । গাছের ফাঁকে , ঝোপের আড়ে । দপ্‌দপ করে অথবা তারার খসে পড়ার মতন কিন্তু লোকেরা ভবতো যে এগুলি হয়ত বা আলেয়া । জংলী গ্যাস থেকে হচ্ছে তাই অত মাথা ঘামাতো না সবাই । কিন্তু এই একটা আজব ঘটনা তো হল ।

এই গল্প শুনে তুঁহু রে রে করে ওঠে !

---কৈ মাসিমণি বলোনি তো আমাদের তোমার সাথে এমনটা হয়েছিলো ? কিছু তো জানাওনি আমাদের তুমি ঘুণাক্ষরেও ?

তাজি মৃদু হেসে বলে ওঠে , কি আর বলি বল ? আমাকে তোরা তখন হয়ত পাগল ভাবতিস্ , তাই বলিনি ।

আজ নাহয় আমি একরকম এসব ভুলেই গেছি কিন্তু তখন আমার খুব অবস্থা খারাপ হয়ে যায় । খালি আত্মহত্যার কথা মাথায় ঘুরতো । বন্ধুরা শুনে আগেই বলে যে ডিপ্রেশানে ধরেছে, নাহলে সুইসাইডের প্রবল ইচ্ছে কেন হবে ? আমার তো কোনো সমস্যা নেই, বেশ তো আছি ! তাহলেই তোমরা বোঝো ! তাই আর ভয়ে বলিনি ।

মাসির কথা শুনে এতদিন পরেও অত্যন্ত মলিন হাসি হেসে ওঠে তুঁহু ও তার ভিডিওগ্রাফার বন্ধু ভজন ভঞ্জ !

এবার ভজন ভঞ্জের গল্প বলার পালা । ভিডিও করতে খুবই ভালোবাসে সে । নামটিও সুছন্দে ভরা । নামেই যেন একরাশ কবিতা তাইনা ?

জন্ম থেকেই তার মনে ছিলো রং আর তুলি । ছোট থেকেই সে রং এর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট । পরে সেই রং-এ লেগে যায় চলমান ছবি । কাজেই হয়ে গেলো সিনেমা এক একটি !

ভিডিওগ্রাফি শিখে ফেলে চটপট্ । কোর্স করে নেয় । তারপরে ক্যামেরা নিয়ে এখানে সেখানে ।

বৃন্দাবনের বিধবারা কেমন আছেন , রাজস্থানের হোলি, চম্বলের ডাকাত , নর্মদার পৌরাণিক কথা, ত্রিপুরার চা বাগান , আসামের চামেলি মেমসাহেবের চা বাগান এইসব ঘুরে ঘুরে ছবি করে । ডকুমেন্টারি ছবি । তারপর এই ভ্রমণ ভুগে প্রবেশ । ভ্রমণ ওড়না । ওদের আয় ভালই হয় । মাসিমণি কিছু নেয়না । অবসর নিয়েছে তাই সময় কাটাতে এইসব করে । আর যা আয় হয় তা আমেরিকান মুদ্রাতে । সেসব তুঁহু আর ভজন ভাগ করে নেয় । তবে ভজন নিজেও মাঝে মাঝে নেশার টানে ঐ ছবি তুলতে যায় এখানে সেখানে । এরকমই সময় এক ভক্তের আবদার আসে তার কাছে । মূলতঃ চামেলি মেমসাহেবের

বাংলোতে ঘুরে আসবার পরেই , সেটা আসামে-- ঐ অনুরোধ আসে ইউ-টিউবে । সোফিয়া বসু ঠাকুরতা নাম্নী এই নারী, সালকিয়া থেকে লেখেন যে উনি একজন স্কুলের ইন্সপেক্টর । কার্যপালনের জন্য একবার ওনাকে একটি দূরের শহরে যেতে হয় । সেখান থেকে সালকিয়া ফেরার সময় একটি দূরপাল্লার বাসে করে যখন ফিরছিলেন তখন রাত প্রায় ১০টা । ঝিরঝিরে বর্ষার রাত । আকাশে কোনো চাঁদ নেই । রাস্তাঘাট কাদায় প্যাঁচ প্যাঁচ করছে । সোফিয়া দেবী ও তার সাথী একটি অল্প বয়সী মেয়ে , কিরাৎ সিং দুজনে অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে একটি বাহনের জন্য যা ওদের সালকিয়া অবধি পৌঁছে দেবে । কিন্তু সেগুড়ে বালি । কোনো গাড়ি আসছে না । দু-একটি ছোটমোট অটো আসছে কেবল । আর লরি । কিংবা বড় পেট্রলের ট্যাঙ্কগুলো । এমন সময় একটি দূরপাল্লার বাস এসে থামলো ।

বললো , কোথায় যাবেন ?

সোফিয়া আর কিরাৎ মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে হেল্পার বলে ওঠে , উঠে আসুন যদি যেতে চান ! এই রাস্তায় সহজে কোনো বাস পাবেন না এখন ।

ওরা একটু ভেবে জানতে চায় যে এটা কোথায় যাচ্ছে ।

হেল্পার বলে ওঠে যে সালকিয়া হয়ে এটা অনেকদূরে চলে যাবে । ওরা অবাক হয়ে যায় যে তাদের গন্তব্য এই লোকটি জানলো কি করে !

সে যাইহোক্ তারা বাসে চড়ে বসলো ।

দেখলো যে তাদের কে একদম সামনের সীটে বসানো হয়েছে আর তারপর থেকে পর্দা দিয়ে ঢাকা ।

হেল্পার এরপরে সিগন্যাল দিলো আর গাড়ি চলতে শুরু করলো । সামনে চালক বসে আছে । এক বৃদ্ধ চালক । গাড়ি চলছে । পর্দার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না । হয়ত লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে । কেবল ওদের সীটটা আলাদা করা । লম্বা বাস । চালকের সরু কেবিন জাল দিয়ে ঘেরা । আলো জ্বলছে । আর অন্যদিকে অনেক সুটকেস্ সাজানো । বাসের মাথাতেও অনেক লাগেজ ছিলো । তবে ত্রিপল দিয়ে বাঁধা । এইভাবে চলতে চলতে সোফিয়া হেল্পারের কাছে টিকিটের দাম দিতে যায় কিন্তু সে নিতে রাজি হয়না । বলে , রেখে দিন দিদি । আমরা এই রুটে রোজই যাই । আপনারা একা একা এত রাতে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তুলে নিলাম । টিকিট কিসের আবার ? ওসব ভুলে যান ।

সোফিয়া ও কিরাতের অবাক লাগলেও কিছু আর বলেনা । অন্ধকার আর বৃষ্টিতে বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছেনা । বাস যেন প্লেনের গতিতে চলেছে । অসম্ভব জোরে যাচ্ছে । এরকম কতক্ষণ গেছে ওরা ঠাওর করতে পারেনা কিন্তু একটা সময় বাস থেমে যায় । আর সার দিয়ে ভেতর থেকে পর্দা সরিয়ে যাত্রীগণ নামতে শুরু করে । মনে হল কোনো স্টপেজ । জায়গায় কোনো প্রখর স্ট্রীটের আলো নেই তেমন তবে অনেকগুলো বড় বড় রড আর কিছু তালগাছ দেখলো যেন আর একটি মিটমিট করে কোনো আলো জ্বলছে কোনো দোকানে মনে হল । বাসের আলোয় দেখলো যাত্রীরা সবাই মেয়ে আর তারা কেউ পোশাক পরা নয় । সবাই উলঙ্গ , চুল খোলা, বিরাট বড় সিঁদুরের টিপ কপালে , মুখ দিয়ে তাজা রক্ত পড়ছে আর সবার গলায় একটি করে বড় মুন্ডমালা ! হাতে মিনি সাইজের রূপার খড়্গ !

এই না দেখে সোফিয়ার হাত চেপে ধরলো কিরাৎ নখ ফুটিয়ে আর গোঁ গোঁ করে জ্ঞান হারালো । তারপর সোফিয়ার আর কিছু মনে নেই । পরদিন সকালে ওদেরকে ঐ এলাকার দুধওয়ালারা, ভোরবেলায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে । তবে স্থানটি ঈশ্বরের কৃপায় ওদের সালকিয়া থেকে খুব একটা দূরে নয় আর ওটার খুব

কাছেই আছে এক শ্মশান যা আজ পরিত্যক্ত । সোফিয়া বলে যে সে নাকি সবসময় একটা ছোট গীতা সাথে রাখে আর কিরাৎ নাকি ওদের ধর্মের মত অনুসারে লোহার বালা এইসব পরে থাকে হয়ত তাই ঐ যাত্রায় বেঁচে যায় সোফিয়া আর তার শিখ্‌নি বান্ধবী ।

ইউ-টিউবে এই কমেন্ট লিখে ভদ্রমহিলা অনুরোধ করে যে একটা বাড়ি আছে উত্তরপ্রদেশে যেখানে নাকি গেলে এইসব অতিপ্রাকৃত ঘটনা চাক্ষুষ করা যায় । আর ভজন যেহেতু ডকুমেন্টারি ছবি করে তাই ওখানে গিয়ে একটা কিছু তুলে আনতে পারবে । সবাইকে তো আজকাল বিশ্বাস করা চলেনা কিন্তু ভজনের ওপরে ওদের খুব আস্থা তাই অনুগ্রহ করে যদি সে যায় । আজকাল লোকে তো সিনেমার মতন ভিডিওতে কারসাজি করে সত্যি বলে চালিয়ে দেয় । তাই ।

ভজন ভঞ্জ অবশ্যি যায়নি শেষঅবধি কারণ ভয় পেয়ে যায় ওখানকার গল্প আন্তর্জালে পড়ে । সত্যি ভয়াল স্থান । যা লেখা আছে নেটে আরকি !

জায়গাটির নাম ফুলেজমিন । ফুলের সাথে কিছু সম্পর্ক থাকতেও পারে । খুবই সবুজ ও সতেজ জায়গা ।

এখানে একটি ভৈরবের মন্দির আছে । এই ঠাকুর হলেন হরিণ, যার দশটা পা । হরিনাভী মহারাজ নাম তার । আর মন্দিরের আশেপাশে অসংখ্য ঢিবি । এগুলি নাকি কবর । তবে কার কবর , কোথা থেকে এলো তা কেউ সঠিক জানেনা । আর এইসব ঢিবি খুবই ছোট ছোট । শিশুদের খেলনা বাড়ির বাসার মতন । আর সংখ্যায় অজস্র । শত সহস্র বললেও ভুল বলা হবেনা । তো এখানে নাকি অনেকেই এর সত্য সন্ধানে গেছে কিন্তু কেউই আর জীবিত রয়ে যায়নি । হয় মৃত কিংবা অর্ধ মৃত ও পরে পাগল হয়ে বেঁচে থেকেছে । আর পাগলামির একটা সীমা থাকে কিন্তু এদের কোনো সীমা নেই । মানে সায়েন্স হয়ত বলবে এরা সাইকোসিসে ভোগে কিন্তু এরা আদতে কেমন যেন জবুথবু হয়ে যায় আর মলমুত্র ব্যাতীত কিছু খায়না ।

যেই বাড়িটির কথা সোফিয়া বলেছে সেটি হল পুরুৎ মশাইয়ের বাড়ি যা পাশেই আছে । এই পুরোহিতই একমাত্র ঐ ভৈরবের পুজো করে আসছে বংশ পরম্পরায় । ওরাই ঐ বাসায় থাকে, পাশেই । ওদের বাড়ির চত্বরে প্রবেশ করতে দেয় , ফ্রিতে ভোগ খেতে দেয় । ওখানে ভৈরবের সাথে শক্তির পুজো পর্যন্ত হয় কিন্তু ক্যামেরা কিংবা সাক্ষাৎকার এইসব চলেনা । এগুলিকে ওরা চালাকি বলে । বলে , এইসব চালাকি এখানে চলবে না । তোমরা কি মনে করেছো ? বিশ্বজয় করবে এইভাবে ? টিভিতে যা দেখানো হয় তার একভাগও সত্যি নয় । কিছু মানুষ হাতে রাজদন্ড নিয়ে বসে যা ইচ্ছে তাই করছে । তারাই এইসব দেখাচ্ছে । কিন্তু ধম্মে সইবে না । মহামায়ার মধ্যে মায়া । আরো মায়া । হ্যাঁ ? ভেবেছো কি মনে ,তুমি যা করছো কেউ দেখছে না ? ভৈরব আর মহামায়া সবই দেখছেন !তাদের শক্তিতেই তুমি করে খাচ্ছো । যখন শক্তি গুটিয়ে নেবেন চালাকি বন্ধ হয়ে যাবে । কাজেই সমঝে চলো ।

কাজেই ঐ কবরে ঘেরা মন্দির সম্পর্কে বিশেষ রহস্য আজও কেউ সমাধান করতে পারেনি ।

লোকে গেলেও ঐ পুরুতের বাসায় ঢুকে , অন্ন ও প্রসাদ খেয়ে ফিরে আসে ।

এই পুরোহিত মহাশয়ের কোনো পূর্বপুরুষকে, কোনো পুলিশ একবার এই রহস্য ভেদ করতে না দেবার জন্য কারাবন্দী করে । কিন্তু প্রতিদিন সকালে তাকে লক-আপে ঢোকালেও সেদিন সন্ধ্যায় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেতোনা আর পরদিন সকালে নিজের বাসায় পাওয়া যেতো । আবার লক-আপে নিয়ে গেলে যথারীতি সন্ধ্যায় হাওয়া হয়ে যেতো সেই পুরুৎ । লোহার বড় বড় তালা আর তার সর্বাঙ্গে শিকলের বেড়াজাল থাকলেও ।

এমন আজব ঘটনা ঘটার পর---- যা ফিজিক্সকে ডিফাই করে ;সাধারণ মানুষ এবং পুলিশও এদেরকে আর ঘাটাতে সাহস করেনি ।

আর একবার কোনো নাস্তিক কিংবা কোনো অসুর জোর করে প্রবেশ করে কিছু অনাচার করেছিলো যা লেখা আছে উইকিপিডিয়াতে ; তারপর যা হয় তা অত্যন্ত ভয়াবহ । ভৌতিক কিছু নয় বটে তবে লোকটি উন্মাদ হয়ে যায় । চূড়ান্ত ওসিডি থেকে সাইকোসিস ও অবশেষ মৃত্যু ।

সে দেখে যে তার ক্যামেরা হাত থেকে পড়ে যায় আর হাতের তালু থেকে ঝরে পড়তে থাকে অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সে নিজেই আর সেগুলোর সাইজ বাড়তে শুরু করে ক্রমাগত আর তা চলতেই থাকে যতক্ষণ না সে পাগলের মতন চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারায় ।

এবারের গল্প দুটি ,করোটি শুনেছিলো অস্ট্রেলিয়া বাসী এক বন্ধু ঘোস্ট হান্টার ও লেখিকা গার্গী ভট্টাচার্যের কাছে । আসলে এই দুটি গল্প যে শুনেছিলো তার মধ্যে একটি এক ভারতীয়কে নিয়ে যে লেখিকার আত্মীয়া আর অন্যটি ওখানকার লোকাল ঘটনা ।

লেখিকা সেই দেশে যাবার অনেক আগেই তার এক আত্মীয়া সেখানে বসবাস করতো । সেই মহিলা চাকরি করতো । তার স্বামী ও সন্তান ছিলো । মহিলা যখন কাজ থেকে ফিরতো, শিশুদের ক্রেশ থেকে নিয়ে আর তখন চা ও জলখাবার নিয়ে বসতো তখন দেখতো যে নিজের

থেকে চা ও জলখাবার কমে যাচ্ছে । প্রথমে নিজের চোখের ভুল মনে করলেও নিয়মিত এই ঘটনা হতে শুরু করে । তখন ভয় না পেয়ে ঐ মহিলা আরো দু-তিনটি চায়ের পাত্র ও খাবারের প্লেট ঐ টেবিলে রাখা শুরু করে এবং দেখে যে তার চা ও খাবারে কেউ থাবা বসাচ্ছে না বরং অন্যগুলো কমে যাচ্ছে ।

এবার মহিলা বুঝতে সক্ষম হয় যে এগুলি অশরীরি ঘটনা । ভয় সে পায়নি কারণ তার ভয় পেলে এই প্রবাসে চলবে না । নিজের সমস্যা এই দূরদেশে নিজেকেই সামলাতে হবে । তার স্বামী এইসব উদ্ভট জিনিস বিশ্বাস করবে না । বলবে ডাক্তার দেখাও । দেশের কাউকে বলবে না কারণ তখন তারা বলবে , এত দূরে যেতে বারণ করেছিলাম । একা একা এইসব জায়গায় ! ফিরে এসো । এখানে কি নেই ? সুপার মার্কেট , বহুতল বাড়ি , বিলাস বহুল ক্লাব সবই তো আছে ! কিসের জন্য এতদূরে গেলে ? কি পেলে ওখানে ?

তাই আর কাউকে বলেনি সে । মেয়েটির নাম নৈঋতা দত্ত । পেশায় সার্জেন । বিদেশে কাজের যে কত সুবিধা , পলিটিক্স কম , স্বাধীনতা , লোকের নাক গলানো ব্যাক্তিগত জীবনে এসব প্রায় নেই এগুলি বাড়ির লোককে

বোঝানো যায়না তাই কোনো কথায় যায়নি । আর এখন ভূতের গল্প বললে তো সব শেষ !

এইভাবে বাস্তব উপায়ে সমস্যার সমাধান করাও সে প্রবাসের সমাজ থেকেই শিখেছে । ওরাই তাকে শিখিয়েছে যে লিভ ইন দা প্রেজেন্ট মোমেন্ট । সমস্যার জন্য কাউকে দায়ী না করে নিজেই সমাধান বার করো । একেবারেই না হলে তখন অন্য উপায় দেখো । অন্য কাউকে দায়ী করে ভিকটিম কার্ড দেখিয়ে কোনো লাভ নেই । নিজের জীবন নিজেকেই কাটাতে হবে । তাই সে এইসব অপ্রাকৃত বস্তু কাউকে বলেনি । আর তার শিশু সন্তান আছে । কাজেই ভয় পেলে ওরাই বা কোথায় যাবে ! কিন্তু মনে প্রশ্ন থেকেই গেছে যে এরা কারা ? আত্মা বলে কিছু না থাকলে এরা কোথা থেকে এলো ?

সেই নিয়েই অনুসন্ধান শুরু করে যা শিখেছে বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে । এবং জানতে পারে যে এই বাসায় আগে যারা ভাড়া ছিলো তারা মাদ্রাজী । সুদূর মাদ্রাজ মানে চেন্নাই থেকে এসেছিলো এবং আদতে দ্রাবিড় দেশের কোনো গ্রামীণ এলাকার লোক ।

এবার ঐসব জায়গাতে কুট্টি চাতান বলে একধরণে বামন ভূত হয় যারা অসম্ভব খাইকুঁড়ে । খেতে দিলে আর

কিছুই চায়না তারা । যদি খেতে দাও তাহলে তারা তোমার বাড়ি অবধি রক্ষা করবে চোর ও ডাকাতের হাত থেকে । এরা আদতে অসুরের আত্মা আরকি ।

হয়ত ঐ মাদ্রাজীদের ঘাড়ে চেপে, সুদূর দক্ষিণ ভারত থেকে এই কুট্টি চাতান অসুরের ভূত বা প্রেত-আত্মা এখানে চলে এসেছে । মনে মনে ভেবেছে যে সম্বর রসম তো অনেক হল এবার সাহেবী খানা খাওয়া যাক্ আর তাই ইডলির বদলে স্যান্ডউইচ্ সাবাড় করতে হাজির হয়েছে এই অস্ট্রেলিয়াতে । তবে সবটাই নৈঋতার অনুমান ।

ভূতের ব্যাপারটা সত্য আর মাদ্রাজী ভাড়াটিয়ার ব্যাপারটা । বাকিটা ওর দুয়ে দুয়ে চার করা আরকি! কুট্টি চাতানেরা ওখানে থেকে থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে ।এটা পুরোটা ওর অনুমান । **এই অসুরদের নাকি পুজো হয় । এদের মন্দিরও আছে দক্ষিণ ভারতে ও শুনলো । সেরকম হলে পুজো দিয়ে আসবে ; এই দুষ্টু খোকাদের জন্য ।**

পরের ঘটনা হল একটি ছেলেকে নিয়ে । ছেলেটি ছিলো টিনএজার । তার বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে যায় যখন সে খুবই ছোট । পরে তার মা মারা যায় বোমা বর্ষণে । মা ছিলো এক নার্স । মধ্যপ্রাচ্যে যায় অসুস্থ মানুষের সেবা করতে আর তখনই বোমাবর্ষণে মারা যায় । সে তখন কিশোর । দাদু ও দিদা তাকে মানুষ করতে থাকে । তখন সে কলেজে পড়ছে আর ছোটমোট কাজ করছে ।

ছোট থেকেই তার ইচ্ছে ছিলো পেট্রলের স্টেশান করার । কারণ তার ধারণা হয় যে এর থেকে অনেক পয়সা করা যায় । অনেক দেশে একে গ্যাস স্টেশানও বলে । দাদু ও দিদাও তার মনোবাসনার কথা জানতো । তারা স্থির করেন যে এই নাতিকে অর্থ দিয়ে ,তার গ্যাস স্টেশান গড়ে তুলতে তারা সাহায্য করবেন । মাতৃহারা ছেলে । আর ছেলেটি এমনিতে বাধ্য । সভ্য ভদ্র ছিলো ।

কিন্তু বিধির বিধান কে আটকায় !

একদিন দাবানলে দাদু ও দিদার খামারবাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে যায় । কিছু পশুকে রক্ষা করা গেলেও অনেক কিছুই হারাতে হয় । যা বেঁচে-বর্তে গেলো তাতে নিজেদের

জীবনটাই চালানো যাবে কোনোমতে । তাই আর গ্যাস স্টেশানে অর্থ ঢালা চলবে না কোনোমতেই ।

এই আকস্মিক দূর্ঘটনায় এতই আঘাত পায় ছেলেটি যে সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে যায় । কোনো কাজকম্মে আর মন লাগেনা । কোনোভাবে একটা মাংসপিন্ডের মতন বেঁচে থাকে । পরে একটা সময়ে গায়ে পেট্রল ঢেলে নিজেকে শেষ করে দেয় । কারণ পেট্রলের সাথে তার একধরণের সখ্যতাই ছিলো যেন । কি যে ভালোবসতো সে পেট্রলকে ! বন্ধুদের বলতো , আমার পেট্রলের গন্ধ খুবই ভালোলাগে । মনে হয় যেন পারস্যের গোলাপের সুগন্ধ নাকে এসে লাগছে ! বিয়ের সময় আমাকে পেট্রলে ভাজা মোরগ আর পেট্রলের ক্রিমে তৈরি কেক খেতে দিবি । মজা করেই বলতো কিন্তু বাস্তব বড়ই করুণ এক মোড় নিলো ;এই পেট্রলের হাত ধরেই ।

আর পরে, সেই কিশোরটিকেই দেখা যেতে লাগলো ঐ খামারবাড়ির পাশে, মাঝে মাঝে । সারাদেহে আগুন জ্বলছে । আর , প্লিজ হেল্প মি , প্লিজ হেল্প মি --এরকম বলে চিৎকার করে চলেছে ।

একমাথা সোনালী চুল । নীলনয়ন । গোলাপী ওষ্ঠ । এই কিশোরটি এতই জীবন্ত যে অনেকেই অগ্নিদগ্ধ এই

মানুষটিকে তুলে নিয়ে ফায়ারব্রিগেডকে ফোন করতে যায় কিন্তু কাছে যেতেই সে বাতাসে মিলিয়ে যায় । এইরকম এতবার হয়েছে যে এখন স্বয়ং পুলিশ ওখানে একটা বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে যাতে বড় বড় গোটা গোটা কালো কালো অক্ষরে লেখা ---

এরকম দেখলে বুঝবেন যে এটা মায়া । কাজেই আর পা বাড়াবেন না । চলে যাবেন কারণ এখানে থামার প্রয়োজন নেই । জীবনের প্রতিটা বাঁকে দাঁড়াবার আমাদের দরকার নেই ।

বন ভয়েজ ।

অনেক পরে অবশ্যি বার হয় যে ঐ খামার বাড়িটা আসলে মালেশিয়া থেকে গোল্ড রাশের সময় ভাগ্যের সন্ধানে আসা এক খনি শ্রমিক অনেক টাকা জমিয়ে কিনেছিলো । সেই সময় এইসব স্থানে খুব একটা লোকে আসতো না । খাড়া পাহাড় ও ঘন বনের জন্য এদিকে লোকের বসতিও খুব কম ছিলো । কিছু বিদেশী, খনির লোকজন ও আদিবাসীগণ এদিকে বাস করতো । তখন সেই মালেশিয়ার মানুষ এখানে বেশ কিছু জমি সাফ করে করে

একটা খামার বানায় । বেশ কিছু ঘোড়া কিনে পোষে । ভ্যাড়া , এমু , হরিণ , মোরগ, হাঁস , গরু, ছাগল, টার্কি এইসব দিয়ে নিজের খামারবাড়ি সাজিয়ে তোলে । ফসলও ফলায় । খনির কাজের সাথে সাথে সে এইসবও করতে থাকে ।

ওর প্রথমা স্ত্রীও ছিলো মালেশিয়ার মানুষ । মোট চারটি সন্তান ছিলো তাদের । কিন্তু লোকটির বৌ, এই চাষের জমিতেই চাষের কাজ করতে গিয়ে ধর্ষিত হয় । খুবই অদ্ভুত ঘটনা কারণ তখন এই এলাকাতে বেশি লোকই থাকতো না । পুলিশ স্টেশান ছিলো অনেক দূরে, অন্য গ্রামে । তার থেকেও ৬৫/৭০ কিমি দূরে খনি নগর জার্বো, যেখানে কাজ করতে লোকটি আসে ।

সেখানে খনিজ পাওয়াতে, অনেক স্থানে তা তুলতে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে যা নয়নাভিরাম ।

এখন জার্বোতেও আর খনিজ নেই । তাই এটাকে মৃত নগরী বলে সবাই । লোকজন অনেক আছে তবে মিনারেল শহর আর নেই । তো সে যাইহোক না কেন ওর বৌকে কে যেন অত্যন্ত নির্মমভাবে ধর্ষণ করে মেরে ফেলে ।

পরে তদন্তে জানা যায় যে বৌটির এক নাগর ছিলো । মালেশিয়াতে । তবে সে কোনো জীবন্ত নাগর নয় ।

এক প্রেত- আত্মা । যাকে লোকে অর্থাৎ স্থানীয় লোকে বলে থাকে ওরাং মিনইয়াক । আমাদের যেমন আছে ব্রহ্মদৈত্যি , পিশাচ , নরখাদক, শাঁখচুন্নি , রক্তচোষা সেইরকম আর কি ! এহল একজাতের রেপিস্ট লাভার । **মানে রেপ করে মেরে ফেলে তবে লাভারের শান্তি ।**

আর কেউ পাবেনা ওকে । আমি সাবাড় করে ফেলবো পুরো । তবে এই ক্ষেত্রে ওরাং মিনইয়াক এতদিন ঘাপটি মেরে কেন ছিলো কেউ জানেনা । তবে আগেই বলেছি গল্পের গরু গাছে ওঠে ! তাই লোকের বক্তব্য হল এই ওরাং মিনইয়াকই ওর পত্নীকে মেরেছে ধর্ষণ করে । নাহলে এই এলাকায় এইরকম কেস কোনোদিন হয়নি আর হবেওনা । কারণ এখানে মানুষের বাস অত্যন্ত কম । চোরই নেই তো ডাকু ! **আর এই ধরণের প্রেত নাকি সারাদেহে অত্যন্ত বেশী তেল মেখে থাকে । আগে সাধারণ তেল মাখতো এখন সভ্যতা খনিজ তেলের ওপরে নির্ভরশীল হওয়ায় ওরা গায়ে পেট্রল মেখে আসে তা লোকে বলে ।** আর ওরাং মিনইয়াকের আত্মা নাকি নিজের লাভারকে মেরে তারপর ঘাপটি মেরে এই খামারবাড়িতেই রয়ে গেছে । তারপর ঐ ছেলেকে ধরেছে

ছোট থেকেই । তাই ওর পেট্রলের গন্ধ এত ভালোলাগে । পেট্রলের ব্যবসাদার হতে ইচ্ছুক ছিলো আর মারাও যায় সেই তেল ঢেলে গায়ে অর্থাৎ পেট্রল মেখে , আগুন জ্বালিয়ে ।

তবে এর কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই , সবই স্থানীয় গপ্পি বুড়ো ও বুড়িরা বলে থাকে, মধুশালায় বসে বসে । তাই কে যেন আবার সরকারি সাবধানবাণীর নিচে খুব ছোট করে লিখেও রেখেছে , বিওয়ার অফ ওরাং মিনায়েক । ব্র্যাকেটে আ ঘোস্ট ফ্রম মালেশিয়া -ইম্পোর্টেড্ ।

সেখানেও মিনায়েক কেটে কে যেন আবার মিন ইয়াক করে দিয়েছে । মানে কারেক্ট করে দিয়েছে ।

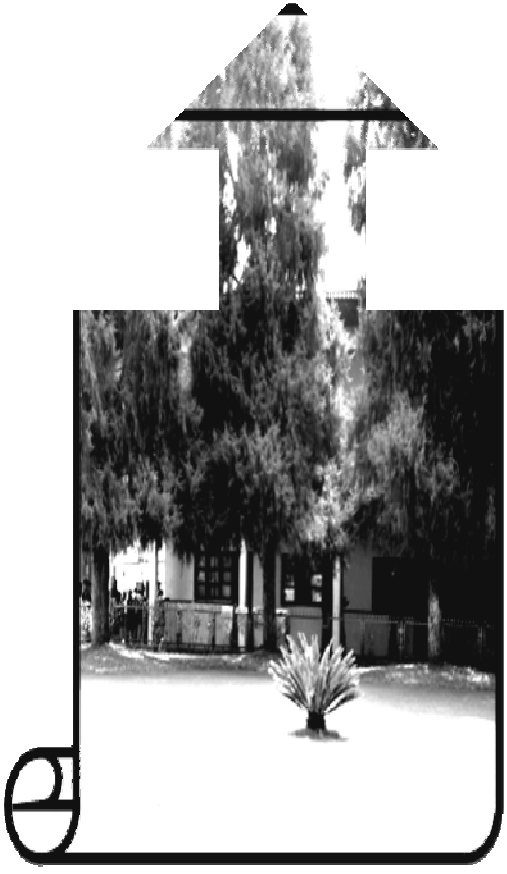

এর পরের দুটো গল্পও লেখিকা গার্গী ভট্টাচার্যের কাছেই শোনা। খুবই আজব ভূতের গল্প। গল্প তো নয় একেবারেই, সত্যি ঘটনা যাকে বলে। অন্তত: লেখিকা সেরকমই বলেছেন, কঙ্কালকে।

সেইসময় উনি ব্যাঙ্গালোরে বসবাস করতেন। ওনার স্বামী একজন সফটওয়্যারের কর্মী। কাজেই অফিসের কাজে এদিক ওদিকে যেতেই হতো। মজা করে ওরা তাকে বলতো, **রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস্ !**

ভদ্রলোক সকালে হায়দরাবাদ তো রাতে, গভীর রাতের বিমানে পাড়ি দিতেন সুদূর জার্মানি। দিনের পর দিন। গার্গী দেবী এমত:অবস্থায় একা একা দিন কাটাতে থাকেন। বন্ধু বান্ধব অবশ্যই ছিলো কারণ মহিলা খুবই বন্ধু বৎসল কিন্তু পরবাসে এসেছেন বিয়ের পরে তাই ততটা সামাজিক বন্ধু বান্ধব ছিলোনা। অচেনা শহর বলে। সে যাইহোক্ একদিন রাতে লেখিকা তার এক দিল্লী থেকে আসা বান্ধবী যে পেশায় দন্তচিকিৎসক তার বাসায় গিয়ে ওঠে কারণ রাতে তার পতিদেব গেছেন অডিটের কাজে সেই মুম্বাই, তাই বাসায় থাকবে না কয়েকদিন।

লেখিকাকে নিয়ে গেছে বান্ধবী । নাম তার অনুসূয়া । শর্টে অনু । লোকে অনু বলে ডাকে । কোটিপতির মেয়ে বলে শুনেছে । নিজে একটি চিকিৎসালয় খুলেছে যেখানে আধুনিক সব যন্ত্রপাতি আছে যা সরকারি হাসপাতালেও নেই । আগে আসামে কাজ করে এসেছে । তাই ভালো হাত পাকিয়েছে । বলতো , আমাদের ওখানে উত্তর পূর্ব ভারতের সব রাজ্য ও বাংলাদেশ ইত্যাদি থেকে রুগী আসতো তাই আমি ভালো ভালো কেস দেখার সুযোগ পেয়েছি । লেখিকা শুধায় , তোর বাবা এতবড় ব্যবসায়ী তাহলে তুই তার একমাত্র কন্যা হয়ে কাজ করিস্ কেন ? মেয়েটি বলে , আরে দূর ওটা একটা জীবন হল নাকি ?

নিজের একটা পরিচয় নাহলে হয় আজকাল ? আমি কে জিজ্ঞেস করলে লোকে ; কি বলবো ? অমুকের মেয়ে , তমুকের বৌ ব্যস্ ? আর আলু ও গোবির পরাঠা আর আচার বানিয়ে আমি জীবন কাটাতে পারবো না ।

গার্গী হেসে বলে, কেন শেষকালে ওর বেওসা খুলে ফেলবি !

অনুও খুব হাসে , তারপর ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে , হেই শালি তুই আমার আচার আর পরাঠা খাবি ? তুই তো

কোনোটাই খাস্ না ! তাহলে আমাকে দিয়ে এই দোকান খোলাচ্ছিস্ কেন ?

লেখিকা বলে, অন্যরা খাবে ।

অনু-- তাহলে অন্যদের ঠিক করতে দে না ।

ওরা তো চায় আমি আপাততঃ ওদের দাঁতটা বাঁধাই আর রং করি ।

হ্যাঁ, দাঁত সফেদ করা , দাঁত যে আর দাঁত নেই এক শিল্পে পরিণত হয়েছে এসব গার্গী ওর কাছ থেকেই জেনেছিলো । আজকাল দাঁতের কতরকম সুপার স্পেশালিটি বার হয়েছে । এমনও নাকি চিন্তাভাবনা চলছে যে দাঁত পড়ে গেলে সেখানে আর ফলস্ বা সোনার দাঁত নয় একদম আসল দাঁত গজিয়ে দেওয়া যাবে । কি করে ? স্টেম সেল দিয়ে । এসবই ঐ দন্ত চিকিৎসকের কাছেই শোনা । অনুসূয়া এমনও বলে যে আমার জন্ম হয়ত এক বড় ব্যবসাদারের ঘরে হয়েছে বাট আই লাইক সেরিব্রাল পিওপেল । আই অ্যাডোর ইন্টালেজেন্সিয়া ।

কুমারমঙ্গলম বিড়লার চেয়ে আমার কাছে রঘুরাম রাজনের গুরুত্ব অনেক বেশি বিকজ হি ইজ আ স্মার্ট থিংকার ।

গার্গী একটু মিষ্টি হেসে বলে ওঠে , কিন্তু আমি তো লেখিকা আমার আবার শব্দের আওয়াজে শিহরিত হতে বেশ লাগে তাই বলি **কুমারমঙ্গলম** নামটা কিন্তু ভারি সুন্দর তাইনা ? এই ধরনা **সমুদ্রমন্থন , জবাকুসুমসংকাশম, মেঘমেখলা , মণিকন্ঠন, যশোসাগর, তুঙ্গভদ্র, রৌহনক, ধীমহী , ভার্গোদেবস্য ।**

তারপর পুন্ডরীকাক্ষম, ময়ুরবাহন, কুমারসেন-- এইসব নামগুলি কি সুন্দর না ?

অনু হাসে কিছু বলেনা । জানে ওর বন্ধুটি একটু ভাবুক ও রোমান্টিক । সে শব্দের গন্ধ পায় আর রিনিঝিনি শুনতে সক্ষম । শব্দের রং দেখতে পায় । তাই চুপ করেই থাকে । পরে অবশ্যি কি মনে করে বলে ওঠে , তুই একটা নাম দেবার অর্গানাইজেশান খোল । আজকাল তো সবকিছুর প্রফেশনাল হেল্প লাগে আর লোকে দেখবি নাম দেবার ব্যাপারে কেমন ক্ষেপে উঠেছে , কে কাকে টেক্কা দেবে নাম দেবার খেলায় আর তোর স্টকে এত নাম ! হায় কপাল আর তুই কিছু করছিস্ না বন্ধু ? কিছু কামিয়ে নে! এই মাল্টিগন্ডার বাজারে । নাহলে গার্গী নামটা বদলে নিজেরই একটা অন্য নাম দেনা !

এই না বলে দুজনেই খুব হেসে ওঠে হাহাহা করে জোরে জোরে ।

সে যাইহোক্ এই জাতীয় সমস্ত আলোচনার মাঝেই ওরা সেইদিনটাও কাটাচ্ছিলো কিন্তু জানতো না সেই রাতে ঠিক কি হবে ।

অনুর ফ্ল্যাটটি ভাড়া নেওয়া ।

ওর পতিদেব একজন কোয়ালিফায়েড্ চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট । এইসব সি-এ দের মধ্যে অনেকেই নিজেকে সি-এ বলে চালিয়ে দেয় কিন্তু তারা হয়ত পুরোটা পাশ করেনি তাই ওর বর বলে কোয়ালিফাইড্ । সে যাইহোক্ মানুষটি কাজ করতো নামী একটি সি-এ ফার্মে তাই অডিটের কাজে তাকে নানান স্থানে ঘুরতে হত । ওর নাম পলাশ । ভালো মানুষ । এই বাড়িটা খুব পশ্ একটি ফ্ল্যাটে । অনেক উঁচুতে । পাশেই জার্মানির সুপারমার্কেট স্পার । আর অন্যপাশে আরেকটি সুবিশাল শপিং মল । ওরা অনেক রাতে খেয়েদেয়ে গল্পগাছা করছে । দুজনে খাওয়া শেষে বিয়ার নিয়ে বসেছে । তবে কেউ বলতে পারবে না যে মদের নেশায় এমন হল কারণ তার জন্য পরের ঘটনা শোনাই যথেষ্ট ।

দুজনে সোফায় বসে । টিভি বন্ধ । ওদের সারমেয় নেই কারণ কেউ বাড়ি থাকেনা । খাবার খেয়ে দুজনে মদ্যপান শুরু করেছে এমন সময় হঠাৎ অনু দেখে একটি হার্ট লাফিয়ে নামছে পাশের টেবিল থেকে । চোখের ভুলে দেখছে ভেবে কিছু বলেনা । পরে আবার দেখে যে পাশের প্যাসেজ থেকে জাম্প করে করে একটি লিভার এসে ওর সোফার পাশে মিলিয়ে গেলো !

এবার অত্যন্ত ঘাবড়ে যায় অনুসূয়া । সে নিজে একজন চিকিৎসক । আর দন্ত চিকিৎসক হলে কি হয় রোজই তো দাঁতে সার্জারি , দাঁত তোলা আর এক্স-রে এইসব নিজে হাতে করছে ! কোন জেনেরাল চিকিৎসক নিজে হাতে এক্স -রে করে বলুন ? তাই অনেক কিছু করার অভ্যাস আছে ওর । কাজেই সহজে ভয় পাবে তো না কিন্তু এমন বিচিত্র ঘটনা কি দেখেছে কভু ?

এইসব ভাবছে এমন সময় গার্গী পরিত্রাহী চীৎকার করে ওঠে , ওরেবাবারে তোর বাসায় ভূত আছে !

অনুসূয়া হাত দিয়ে একটা ভঙ্গিমা করে বলে না না , কি যাতা বলছিস্ ? ভূত কোথা থেকে আসবে ?

লেখিকা চিল্লিয়ে পাড়া মাথায় করে বলে ওঠে, দরজা খোল , শীঘ্রি খোল , আমি আর একমূহুর্তও এখানে থাকবো না ।

আসলে সে যা দেখেছিলো ঠিক তাই । একই জিনিস দেখেছে লেখিকাও । দুটি কিডনি , একটি ফুসফুস্ আর গোটা ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র হাত ধরাধরি করে গোটা প্যাসেজে নেচে বেড়াচ্ছে !

আর এমন কথা কেউ শুনেছে কোনোদিন ?

গার্গী তো ফ্ল্যাটের চাবি অনুসূয়ার হাত থেকে একপ্রকার ছিনিয়ে নিয়ে দৌড় ! সোজা নীচে ! লিফট দিয়েও না । ভয়ে । ওখানেও যদি এইসব ছাইপাশের নৃত্য দেখা যায় তখন কি হবে ? তাই সে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে আসে নিচে । এসেই একটা হুলুস্থুল বাধিয়ে দেয় । **ভূত ভূত ওরেবাবা রে । ভূতের বডিপার্টস্ ডান্স করছে , আমাকে খেয়ে ফেল্লো রে ।**

এইসব করতে করতে অনুসূয়াও নামে । তবে লিফটে । সে মনে হয় চিকিৎসক বলে একটু সাহসী ।

নিচে এসে লোকজন জড়ো করে ওরা । রাত ততবেশিও হয়নি তখন । শেষকালে সিকিউরিটির লোকের কাছে

শোনা যায় যে ঐ ফ্লাটে কিছু হয়নি । তবে ওখানে এক গণ্যমান্য রাজনীতিবিদ্ বাস করতো । লোকাল মানুষ, কোনো মন্ত্রী সান্ত্রী নয় । ছোটখাটো দাদা টাইপস্ ।

সেই ব্যাক্তি নাকি এইসব অর্গ্যান ট্র্যাফিকিং এর চক্রে ধরা পড়েছিলো একবার নয় বহুবার । প্রতিবারই রাজ্য বদলে কাজ চালিয়ে যেতো । তারই ফ্ল্যাটে এসব জিনিস অনেকেই দেখে তবে সব ভাড়াটে দেখেনি । কেউ কেউ হয়ত একটু বেশি সংবেদনশীল বা সেন্সিটিভ যাকে বলে । কিছু ভাড়াটে বাসাবদল করে চলে গেছে আর যাদের সাথে কিছু হয়নি তারা রয়ে গেছে । এখন ওর পরিবার এই ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়েছে অন্য কাউকে ; তারাই ভাড়াটিয়া বসায় । মোট গোটা সাতেক পরিবার এখানে ভাড়া এসেছে ঐ ব্যাক্তি চলে যাবার পরে । আসলে শেষে ওকে পুলিশ এনকাউন্টারে মেরে দেয় কোথাও । হয়ত তাই এসব হচ্ছে ।

অনুসূয়া বলে ওঠে , হ্যাঁ আমরা সিনেমায় দেখি , খবরের কাগজে পড়ি যে এসব এখানে হয় । হাসপাতালের আড়ালে । কোনো ডাক্তার যে এসব করে ! আমরা চিকিৎসকেরা মানুষ মারার জন্য কি এই বিদ্যা আয়ত্ব করেছি ? কি যে হচ্ছে আজকাল ।

দীর্ঘশ্বাস ।

আর লেখিকা গার্গী বলে ওঠে , আমিও এরকম কিছু ঘটনার কথা জানি যা আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া । হাসপাতালে চিকিৎসা করতে গিয়ে অর্গ্যান খুইয়ে এসেছে । টন্সিল অপারেশান কিংবা অ্যাপেন্ডিক্স অথচ খোয়া গিয়েছে অন্য কিছু । এরকম আমি আমাদের বন্ধুদের মধ্যে শুনেছি । ধরুন আপনি কম্পিউটারে কাজ করছেন , হঠাৎ একটি কিডনি এসে লাফিয়ে আপনার টেবিলে বসলো !

কেমন লাগবে আপনার বলুন তো ?

--------H-h-horrendous!!

সবাই একসাথে বলে ওঠে ।

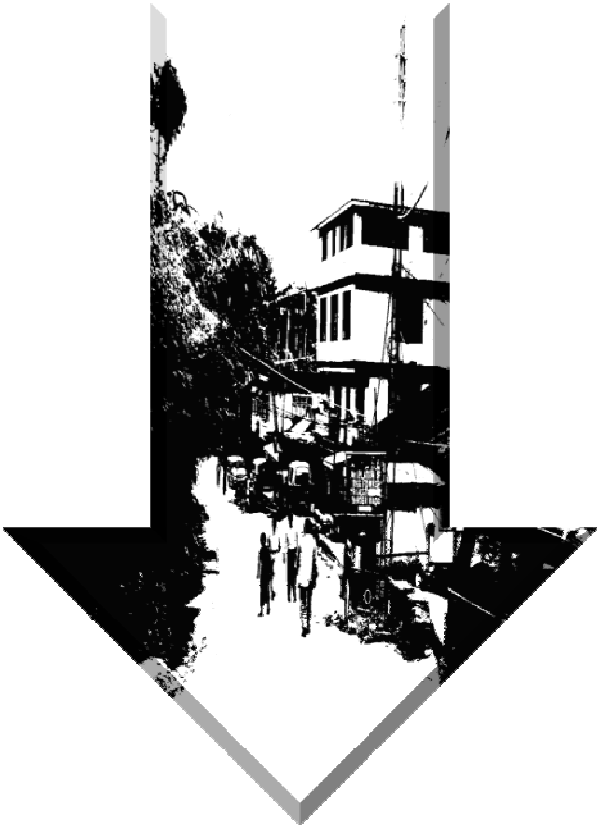

আমরা এবার লেখিকা গার্গীর পরের গল্পে চলে যাবো ।

এটাও এই শহরের গল্প যদিচ এই কাহিনীর সুত্রপাত বিদেশে । আমেরিকার এক অল্পখ্যাত শহরে নিজের হাঁটুর চিকিৎসা করায় এক নর্তকী । তার নাম সাহানা সাহা । নামটি খুব সুন্দর । তার বাবার ছিলো পৈত্রিক নানান ব্যবসা কারণ সবাই জানে যে সাহা এই বাঙালি জাতিরা ব্যবসাদার হয়ে থাকেন । কিন্তু সাহানার বাবা তাকে বলে অন্য কিছু করতে । বলে যে লোকে অর্থ কামানোর জন্য কত কিছুই তো করে । আর আমি তোমার জন্য সবকিছু তো করে রেখেছি । তুমি বরং অন্য কিছু করো যা তোমার ভালোলাগে ।

কাজেই সুন্দরী সাহানা যার সৌন্দর্য্যের একটিই একটু কম আছে তাহল তার নাকটি একটু চাপা লোকে তাই তাকে গুড়িয়া বলে ডাকে । আসলে জাপানি গুড়িয়া বলতে বলতে অনেক বড় নাম কেটে শর্টকাট হল গুড়িয়া । এটা তো স্ক্রিন নেম । মানে সমাজের লোকের ডাকা নাম ।

আর আমাদের জীবনতো একটা মুভি বা প্লে তাইনা ?

এই সাহানা হল নাচিয়ে । ধ্রুপদী নাচিয়ে । তবে অল্পবয়সী মেয়ে কিন্তু বাতে ভুগছিলো । এহল এক আজব বাত । যেই মেয়ে এত দৈহিক কাজ করে ও ফিট্ আর খাওয়াদাওয়াও তার স্বাস্থ্যকর তার বাত হল কি করে ? সে তো আজকাল কতনা কম বয়সে কত কিইনা হচ্ছে । তাই সে চিকিৎসকের কথামতন চলতে শুরু করে । কিন্তু এতে তার নাচের ক্ষতি হয় ।

নর্মাল হাঁটাচলা করলেও তার নাচের নানান মুদ্রা করতে অসুবিধে শুরু হয় । দেহকে ঝাঁকাতে ও বেঁকাতে ভীষণ ভীষণ কষ্ট হয় । আর নাচ তার হৃদস্পন্দন । প্রতিটি লাব ডুব তার নৃত্যের তালে তালে চলে । নাচ থেমে গেলে সেও আর জীবিত থাকবে না । এতই আকর্ষণ তার নাচের প্রতি। তাই ওষুধগুলো গিলে খেলেও তার নৃত্য শিল্পের কাজে ব্যাঘাত ঘটতে শুরু হয় ।

এমন সময় সে আমেরিকাতে বেড়াতে যায় । দিদি হল বাবার আদরের একমাত্র বড়মেয়ে - দিদি থাকে আমেরিকায় । তার জামাইবাবু ব্যবসাদার । তবে দিদি নিজের শখেই পড়েছে । বাবার নির্দেশে নয় । নাম তার কৌবেরী । কাবেরী নয় ।

সে একজন ডিজাইনার, ডিজাইন পড়েছে । নিজের ডিজাইন করা জিনিস বাজারে বিক্রি করে দোকান খুলে । সেখানে এক ক্রেতার সাথে আলাপ হয় যার নাম ব্রুনো । সেই লোকটি একটি সামুদ্রিক ঝিনুকের দ্বারা সৃষ্ট নর্তকীর মূর্তি উপহার দেয় সাহানাকে । আর সেই স্ট্যাচু বাসায় আনার পর থেকেই গোলযোগ শুরু হয় ।

আসলে এটা বলা বোধহয় ঠিক না যে এই মূর্তি থেকেই গোলমাল শুরু । লোকটি এক জড়িবুটির অ্যাফ্রিকান চিকিৎসকের কাছেও নিয়ে যায় দুই বোনকে । সাহানা ও তার দিদি কৌবেরীকে । সেখান থেকেই এই বিপত্তি ।

কারণ ঐ বুড়ি নাকি পারে সমুদ্রের ঝিনুক দিয়ে তৈরি এইসব মন্ত্রপূতঃ জিনিস ছুঁইয়ে লোককে ভালো করতে । এতে সাহানার বাত সেরে যাবে একেবারে । এই বলে নিয়ে যাওয়া । তা বাত কিন্তু সত্যি বাতাসে মিলে যায় । ওকে ঘিরে বসে একজন অত্যন্ত বয়স্কা ব্যক্তি কিছু চেলাচামুন্ডা নিয়ে আর অজস্র জড়িবুটি ও তার থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া দিয়ে কিসব মন্ত্র পড়ে পড়ে ওর দেহে ঝিনুকের একটি লম্বা বস্তু স্পর্শ করাতে থাকে । অনেকক্ষণ এরকম হবার পরে ও ছুটি পায় । এরপর বেশ কিছু সপ্তাহ পরে ওর বাতও সেরে যায় । কিন্তু ঐ সমস্ত ক্রিয়াকর্ম থেকেই হয়তবা কিছু অনিষ্ট হয় তার ।

হয়ত প্রেত- আত্মা জুটে যায় ওদের সাথে নাকি কোনো ঋণাত্মক শক্তির আবেশে কে জানে, সাহানার নাচ শুরু হলেও, সে নাচতে গেলেই এক মূর্তিমান কঙ্কালকে দেখতে পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে অবিকল তারই মতন নানান মুদ্রা করে করে নাচছে।

প্রথমে কয়েকবার চোখের ভুল মনে করেছে। পরে পরিবারের লোকের সাথে আলোচনা হয়েছে।

শেষকালে একটি বড় প্রোগ্রামে যা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ সে স্টেজে পড়ে যায়; হোঁচট খেয়ে ঐ জলজ্যান্ত কঙ্কালকে নিজের সামনে নাচতে দেখে।

এরপরে অনেক চিকিৎসার চেষ্টা হয়। দৈহিক ও মানসিক; কোনো বিশেষ রোগ ধরা পড়েনা। এমনকি বাতটাও সেরে গিয়েছে। কিন্তু কেন যে নাচতে গেলেই ঐ কঙ্কাল এসে সামনে নাচতে আরম্ভ করে কেউ জানেনা।

শেষকালে সাহানা সাহার নাচ, জীবনের মতন বন্ধ হয়ে যায়।

--আসলে তার কপালে নাচই নেই তাই এমন হল। পর পর দুটো ঘটনা। অসময়ে বাত হল যা নর্মাল নয় আর এমন আজব ব্যাপার, বলে মুখটা গম্ভীর করে তাকায়

ওর বন্ধু দর্শনা । সেও খুব ভালো নাচে । আজকাল তার নাচের আসরেও আর যায়না সাহানা । ভয়ে , যদি সেই কঙ্কাল আবার হানা দেয় !

যদিও ওর কাজিন অভিরূপ সাহা যে একজন ব্রিলিয়্যান্ট সায়েন্টিস্ট সে বলে ওঠে , আরে বাবা ভূত ফূত কিছু নেই । এগুলো হল মনের ভ্রম । আমার মনে হয় আজ যা ভূত কাল তা সায়েন্স বার করেই ফেলবে তখন কিছু বাবাজী আবার নতুন ভূতের সঞ্চার করবে সমাজে, যারা শক্তিশালী । তাহলে সাহানা দিদিভাই এর এই অবস্থা কেন ? আসলে আমার মনে হয় , বলে মাথায় ঠ্ক-ঠ্ক করে টোকা মেরে বলে চলে সে , দিদিভাইয়ের চোখে সমস্যা । সমস্যাটা মাথায় নয় । **ওর হয়ত এমন কিছু চোখে হয়েছে যাতে করে ও সামনে এসে দাঁড়ানো লোকের ব্লাড অ্যান্ড ফ্লেস ভেদ করে স্কেলেটন দেখে ফেলেছে একেবারে ! আর ভাবছে যে কঙ্কাল বা ভূত দেখছে । কিন্তু ওর চোখে হয়ত এক্স-রে এর মতন কোনো রশ্মি এসে জমেছে যা আমাদের কাছে অজানা । তাই লোকে এমন ভয় খাচ্ছে । সায়েন্স যখন ওটা করে দেবেনা তখন দেখবে**

ভূত ফূত কিস্‌সু না এসব অনেকেরই হচ্ছে। ওর একটা আনকমন রোগ তো হয়েছে মানে অতি অল্প বয়সে বাত। তার মানে লজিক বলছে সি ইজ প্রোন টু এইসব হাবিজাবি আনকমন ailment –in this case she is ডিজিজের ফার্স্ট ক্যারিয়ার, কাজে কাজেই !

করোটির যা যা কাহিনী মেলে ধরার কথা তা প্রায় শেষ হতে চললো । আর দুটো গল্প বাকি । এবার গল্পের আগে মাসিমণি মানে তাজমহল সিমেন্ট চপ ভেজে আনলো । মিক্সড্ পকোড়া । ডিমের চপ । নানান এলাহি কারবার । ওমা ! করোটি ফুরুৎ করে মানুষ হয়ে গেলো । তার ছায়াদেহ মেলে ধরলো সবার সামনে । আস্তে আস্তে ধোঁয়ার একটি অবয়ব হয়ে গেলো । এক্টোপ্লাজম্ । তারপরে বললো , আমিও খাবো , এই আমাকেও দাও ! কতদিন খাইনি এইসব ভাজাভুজি !

তুঁহু একটু ভয় পেলেও অত্যন্ত স্মার্ট হাতে কুহু এবার মেলে ধরে চপের প্লেট তার দিকে । আর সত্যি তো যার বাবা ভূত নিয়ে গবেষণা করেছে তারা কি এতই ভীতু ?

চপের সাথে গরমাগরম কফি । নেসকাফে । ফিল্টার কফি নয় যদিও এতক্ষণ দক্ষিণের গল্প হচ্ছিলো !

সেসব খেতে খেতে এবার বায়বীয় দেহে গল্প শুরু করলো খুলি । ওরা ওকে এখন খুলিদা বলে ডাকতে শুরু করেছে যাতে সবকিছু একটু নর্মাল হয়ে যায় । **আসলে খুবই ভয়ের তো সবটাই তাইনা ?**

খুলিদা বলে চলে যে প্রেত সবসময় মানুষের ক্ষতি করেনা অথবা ভয় দেখায় না কিংবা হাসায়ও না । তারা অনেক সময় অজান্তেই হয়ত উপকার করে ফেলে ।

যেমন এই গল্পটি । এটা এক ভদ্রলোকের গল্প ; নাম সমরখন্দ ভট্ট । শর্টে সমর । লোকে বলে স্যামরা । আর আড়ালে ছ্যামড়া । কারণ লোকটি অত্যন্ত বদমাইশ ।

একটি কোম্পানি খুলেছে সেখানে খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা হয় । পাপড় থেকে শুরু করে , আচার , মোয়া , নাড়ু , চানাচুর এইসব শুকনো খাবারের কারখানায় কাজ হয় আর তা দেশে বিদেশে রপ্তানি হয় । ইদানিং সে মশলার ব্যবসাও শুরু করে । তবে তার প্রোডাক্ট সত্যি ভালো । লোকে খুব কেনে । ঝেঁটিয়ে কেনে । ভেজাল দেয়না তাই সুস্বাদু । আজকাল ক্যামেরার যুগ । এমনই অবস্থা যে মাতৃজঠর থেকে শুরু করে স্নানঘর কোথাওই আর ক্যামেরা ঘুরতে বাকি নেই , এমত অবস্থায় কোনো বেচাল দেখলে কেউ না কেউ তো জানাতো কিন্তু আজ অবধি কেউ কিছু ধরতে সক্ষম হয়নি । যে কেউ ওদের কারখানায় হানা দিয়ে দেখতে পারে কীভাবে সব তৈরি হচ্ছে । গাইডেড ট্যুরও নেওয়া চলে । সবই ভালো তবে লোকটির চরিত্রটা খুবই লুজ । কর্মীদের মাইনেপত্রও ভাল দেয় ইন্ডাস্ট্রি অনুযায়ী কেবল ওর যৌন লোভটা

যদি একটু কম হতো । তবে এমন নয় যে সে নিজের কর্মীদের হেনস্থা করে বা শিশুদের কিংবা কিশোরীদের অথবা পুরুষদের । বরং সে এগুলির বিরুদ্ধে গলা ফাটায় । **তার দুর্বলতা : রূপবতী নারী ।** কুমারী, রুচিশীলা আর যে রাত কাটানোর পরে বিয়ের জন্য চাপাচাপি করবে না । এরাই তার গার্লফ্রেন্ড হতে সক্ষম ।

এরকম অনেক কুমারী ও সুন্দরী তার শিকার হয়েছে কিন্তু অনেক মেয়েই তো নৌকা ভিড়াতে চায় ঘাটে ! নোঙর করতে চায় । তারা ওর সাথে আর যোগাযোগ রাখতে পারেনা । সে নিজে অবিবাহিতা । কারণ তার একই মেয়েকে বেশিদিন ভালোলাগেনা । অরুচি এসে যায় । আর নিত্য নতুন কুমারী ও রূপসীদের সে কামনা করে । আর করবে নাই বা কেন ? নিজে ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে । জ্বালিয়াতি করেনা । লোক ঠকায়না । তাতে সবসময় লাভ যে উপচে পড়ে তাওনা কিন্তু সেটা সে মেনে নেয় । অর্থের প্রতি তার অত আকর্ষণ নেই যত সুন্দরী ও কুমারী মেয়েদের প্রতি । ও অপ্সরা চায় । বিয়ে করে রোজ সেই একই বৌ সে কল্পনাই করতে পারেনা । বোর হয়ে যাবে । আর বৌ ফৌ এর দায়িত্বও সে নিতে পারবেনা । এইতো ব্যবসার এত্তো লোকের দায়িত্ব সে নিয়েছে ! আর কত দায়িত্ব নেবে ?

সেই গানটা মনে পড়ে , হাউ মেনি রোড্স মাস্ট আ ম্যান ওয়াক ডাউন বিফোর ইউ কল হিম আ ম্যান ?

দায়িত্বের সংজ্ঞা কি ? সেই একই পেট ও পাছা দিনের পর দিন দেখা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর সহ্য করে যাওয়া । পারবে না ! ও পারবে না । ও কুহকিনীর সঙ্গ চায় ! কি করবে ? ও এরকমই । এই ওর জীবন দর্শন । এই ওর লাইফ । আর সবাই জানে , ইটস্ মাই লাইফ কাজেই আমিই স্থির করবো আমি কি করবো না করবো । তাই না ।

কোনো মহামানব বলে গেছেন কিংবা অনেক মহাপুরুষও হতে পারে যে কিছু চাইবার আগে শতবার ভেবে নিও ঠিক কী চাইছো তুমি । কারণ আমাদের ইচ্ছে শক্তির পাওয়ার কিন্তু মারাত্মক ।

এটা বোঝার সবচেয়ে সোজা উদাহরণ হল এই ব্যাক্তির জীবন সম্পর্কে জানা ।

সমরের জীবনে একদিন সত্যি সত্যি এলো এক অপরূপ রূপবতী কন্যে । সে তার কারখানায় কাজ নিয়ে এলো । এত সুন্দর যে কোনো মানুষ হতে পারে তাকে না দেখলে বিশ্বাস হয়না । এক তো আমরা দেখি মুভি স্টারদের । তারা সবাই সুন্দর নয় । ফটোজেনিক । অর্থাৎ ক্যামেরায় সুন্দর লাগে । আর আরেক জাতের রমণী আছে যারা

সত্যি রূপসী । তাদের না লাগে ক্রিম, পাওডার , ব্লাশার ও লিপস্টিক আর না লাগে ফেসিয়াল ও এটা সেটা । তারা জন্ম থেকেই সুন্দরী আর আকর্ষণীয়া । যেন সত্যি অপ্সরা । স্বর্গের ডানাকাটা পরী এক একজন ।

এমনই এক পরী এলো তার ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে ।

কিন্তু সমরখন্দ ভট্ট মশাই তো এইসব ব্যাপারে বেজায় শক্ত ও নীতিবাগিশ । নিজের কর্মচারীদের সাথে যৌনক্রিড়াতে লিপ্ত তো সে হয়না । তাহলে ?

আসলে কুহকিনীর জালে জড়ালে কি না হতে পারে !

ব্যাপারটা খুলেই বলি ।

সমর একদিন রাতে একটি দূরের শহরের পাবে মদ খেয়ে ঢুলে পড়ে । ঠিক তখনই এক সুন্দরী মেয়ে এসে ওর টেবিলে বসে পড়ে । এত্তো রূপসী কাউকে সে দেখেইনি কোনোদিন ! চোখ দুটো কচলে নিতেই মেয়েটি বলে ওঠে , আমরা একসাথে এক এক কাপ কফি খেতে পারি ?

আরে কফি কি ! এর জন্য সারাটা দুনিয়া কিনে ফেলা যায় ! সাথে সাথে আর্জি মেনে সে রাজি হয়ে যায় । দুই কাপ কফি ও কিছু হাল্কা খাবার নিয়ে বসে । মেয়েটি

গল্প করে চলে যায় । পরে ও বলে , আমিই তোমার বিল পে করে দেবো ।

সেই বিল দিতে গিয়ে দেখে যে এই অচেনা মেয়েটি অনেক কিছুই কিনেছে যা তার বিলে এসে গেছে । যেমন একটি পার্ফিউম , ডিজাইনার ব্যাগ , রুমাল, ডিজাইনার মাস্ক , ফুলের তোড়া, নতুন মোবাইল, এইসব । ফুলটি অবশ্যি তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলো যাবার আগে ।

পরে ওকে মেসেজ করে জানায় যে এতবড় এক ব্যবসাদারের সাথে দেখা করবে বলে এগুলি ঝট্ করে কেনে কিন্তু ও বিল দিয়ে দেবে বলে আর পে করে না । তাতে করে সমর মনে করে যে বেশ রুচি আছে । একঘেয়ে ব্যাগ না নিয়ে নতুন কিনে তারপর আসছে । এইরকম । তারপর তাকে নিজের কোম্পানিতে নিয়ে নেয় । নিজের সেক্রেটারি করে । একদম নিজের ঘরে বসায় । তার সেক্রেটারি ছিলো আর একজন যুবক তাই একে

ইমেল ও মেসেজ চেকের জন্য রাখে ।

শেষকালে প্রায় ফ্যাক্টরির সংলগ্ন অফিসেই থাকতে শুরু করে সমরখন্দ ভট্ট । কিযে আছে মেয়েটির মধ্যে ! এত নারীকে দেখেছে , স্পর্শ করেছে । তারা সংখ্যায় অসংখ্য হয়ত গুনে শেষ করা যাবেনা । আর সে তো কোনো

রাজপুরুষ বা মুভি স্টারও নয় কিন্তু তবুও । তবে তাদের কাউকে মন দেয়নি আজ পর্যন্ত । কিন্তু এই মেয়েটি !

এর গা থেকে জুঁই ফুলের সুবাস আসে কেন কে জানে ।

কেশেও সুগন্ধী তেল হয়ত । মন গেয়ে ওঠে ,

--***আলগা করোগো খোঁপার বাঁধন , দিল ওহি মেরা ফাঁস গ্যায়ী , বিনোদ বেণীর জড়িন ফিতায় আলগা ঈশক্ মেরা কস্ গ্যায়ী ------বেহুঁশ হো কর গির পড়ি হাথ মে বাজুবন্দ মে বস্ গ্যায়ী ।***

আগে ভাবতো পারফিউম/সেন্ট হবে হয়ত । কিন্তু পরে বুঝেছে যে ওটা ওর দেহের সুবাস । ও যেন কস্তুরী মৃগ !

নিজের সুগন্ধ দিয়েই সমরের হৃদয় ছুঁয়ে গেলো ।

আজকাল সে অর্ধ নগ্ন হয়ে , সুইমিং স্যুট পরে সমরের কোলে বসে কাজ করে । ওর চেয়ারটা খালিই থাকে ।

এইরকম করতে শুরু করলে অফিসে ও কারখানায় কানাঘুষো শুরু হয় । এমনি কিছু নয় তবে এইরকম কথা শুরু হয় যে মালিক কি তাহলে এবার সত্যি সত্যি একটা বিয়ে করবে ? সংসার করবে ? ফ্যাক্টরির ওয়ারিশ আসবে ? এইসব যা সাধারণ লোকের মনে প্রশ্ন থাকে ।

সবাই তো চায় একদিন না একদিন নিজের একটা ঠাঁই হোক্ । একটা বন্দরে গিয়ে আমার পালতোলা জাহাজটা নোঙর করুক !

কিন্তু ঐশ্বরিক কিছু যদি থেকে থাকে তা চলে ভিন্ন পথে আর আমরা মানুষেরা আগে থেকে এইসব বুঝতেও সক্ষম হইনা ।

এই রূপবতী মেয়েই যার আসল নাম কি কেউ জানেনা । নামহীন, গোত্রহীন এই নারীকে সমরখন্দ অনেক নামেই ডাকতো । ঝিল্লি , রিমঝিম, প্রজাপতি , হংসী , ফুল এইসব আর সেই কেড়ে নিলো সমরের পিতৃদত্ত প্রাণটা । হ্যাঁ, সে এক অমাবস্যার রাত ।

কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে । অনেক রাত তখন । মালিক ও তার নতুন সাথী ঘর থেকে বার হচ্ছেনা দেখে যেই না পাহারাদার ওদিকপানে হানা দেয় তখনই দেখতে পায় ওদের মালিকের লাশটা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে মাটিতে । আর এক ফোঁটা রক্তও নেই চারপাশে ।

মেয়েটি পলাতকা । তার ব্যাগ , লিপস্টিক , সবই আছে । রুমাল । কিন্তু সে কেবল হারিয়ে গেছে । না আছে পায়ের ছাপ না আছে হাতের আঙুলের কোনো চিহ্ন ।

যেন উবে গেছে পুরো কর্পুরের মতন ঘর থেকে !

পুলিশ অনেক ফাইল ঘেঁটে, তদন্ত করে বার করে যে এই ঘটনা কোনো মানবীর দ্বারা ঘটেনি । এটা হল মোহিনীর কাজ । মোহিনী হল এক প্রেতের নাম । সে ছলনা করে । কুহকিনী । মায়াজালে ফাঁসিয়ে মানবদের হত্যা করে নির্মম কায়দায় । তার বেশিরভাগ শিকার হয় পুরুষ মানুষ । তবে এইসব ঘটনা হল রহস্যময় যার কোনো সমাধান আজ অবধি মেলেনি । তাই লোকে এই জাতীয় হত্যাকান্ডকে মোহিনী দ্বারা কৃত বলে থাকে ।

এই অতৃপ্ত আআ প্রেমের সন্ধানে ঘোরে কারণ বেঁচে থাকতে সে ভালোবাসা পায়নি । তাই পুরুষের ঘরে ঢুকে প্রেমের নাম করে তাকে কুপিয়ে মারে কারণ সে নিজে ছিলো লগ্নভ্রষ্টা এক নারী । যার কপালে ভালোবাসা জোটেনি কখনো ।

তবে এইসবই হল গল্পগাথা । সত্যি মোহিনী বলে কিছু আছে কিনা তা তর্কের বিষয় । তবে এই ঘটনার পরে সমরখন্দের ভাই ঐ কোম্পানিটি বিক্রি করে দেয় । আর যেই ব্যাক্তি কিনে নেয় তার ছিলো অসংখ্য ব্যবসা এবং ভদ্রলোক এক ফ্যামিলি ম্যান আর তার অজস্র ছেলেপুলে

। তা মোট গোটা আট/নয়জন । আসলে ছেলে হতে হতে এই হাল । একটি মেয়ের জন্য এত্তোগুলো হয়ে যায় ।

লোকে ছেলের জন্য এটা করে আর উনি একটি মেয়ের জন্য উল্টোটা । আর বলে , আরে বাবা মেয়ে নাহলে হয় বলো ? ওরাই তো ধারণ করেছে ধরিত্রী ! ওরাই তো আমাদের মা । বৌ না থাকলে বাড়ি ফিরে কার সাথে গল্প করবো ? কে আমাকে বকবে সময় মতন ওষুধ না খেলে ? আর আমার মেয়ে আমাকে বকুনি দেয় , ফোনে , বাবা তুমি এত মিটিং করছো , এখন তোমার বেরিয়ে পড়ার কথা । মনে আছে আজ আমরা বেড়াতে যাচ্ছি ?

এই আমার ফার্স্ট ফরেন ট্যুর !

মেয়েটি আগে বাবা ও মায়ের সাথে গিয়েছে কিন্তু এই প্রথম বন্ধুদের সাথে যাচ্ছে বিদেশে । তাই বাবা ওকে বিমানে তুলতে যাবে ।ভদ্রলোকের এইসব খুব ভালোলাগে । পরিবার, পরিজন । লোকজন । **হয়ত আগের মালিকের গল্প শুনে মোহিনীকে ভয় পায় । কে বলতে পারে ? কার মনে কি চলে ?**

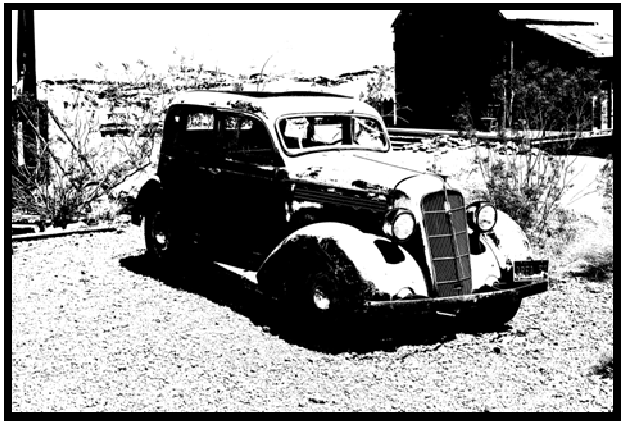

শেষ কাহিনী হল বিষুবরেখা । এইরকম ভাবেই বললো খুলিদা। কেন হঠাৎ এই রকম বললো তা কেইবা জানে । তবে এই গল্প কিন্তু ঘরে শোনালো না । বললো, আমাকে নদীতে তর্পণ করে ফেলে দেবার আগে ওখানেই লাস্ট গল্প শোনাবো চল । তাই ওরা খুলি টুলিগুলো সাথে করে নিয়ে নিলো আর ছায়া খুলিদা চললো ওদের সঙ্গে সঙ্গে । ঘন বনের মধ্যে দিয়ে পথ -মাঝে হন্টন । দুদিকে সবুজ বন এখন কালো মনে হচ্ছে । মাঝে মাঝে শেঁয়ালের ডাক । আকাশের দিকে চেয়ে ডেকে উঠছে , হু-উ-উ-উ-উ-ক-কা করে । গা ছম্‌ছম করে ওঠে । কেমন ভৌতিক পরিবেশ । পায়ে পায়ে চলতে শুরু করে ওরা সবাই । গল্প শুনতে হবেনা ?

খুলিদা বলে ওঠে , এবার আমার গল্প শুরু হল , শোনো তাহলে।

অনেকটা এরকমই এক পরিবেশ থেকে এই গল্পের আরম্ভ । একটা গ্রাম ছিলো বাংলায় । নাম ধরো তিরি । এই গ্রামে একধরণের মানুষের বাস ছিলো তাদের বাংলা, বিহার ও আসামে লোকে বলতো পিছড়ে বর্গ বা পিছিয়ে থাকা শ্রেনী কিন্তু তারা এটাকে ভালো ভাবে নিতো না । এইকারণে এদের মধ্যে কিছু বুদ্ধিমান মানুষ ঐ এলাকার উঁচু জাতির ; কুৎসিত ও দরিদ্র মেয়ে যাদের বিয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না অথবা অন্ধ, যুদ্ধে বা দূর্ঘটনায় বিকলাঙ্গ , বাক্‌শক্তি হীনা , শ্রবণশক্তি হীনা এদেরকে বিয়ে করে করে এক নতুন শ্রেনীর সৃষ্টি করে যারা হল শংকর জাতি । **এদেরকে এরও ১০০ বছর পরে উচ্চজাতের পুরোহিতের সাহায্যে নব এক জাতির মর্যাদা দেওয়া হয় যার নামকরণ হয় যোদ্ধা জাতি । কারণ এরা যুদ্ধ করে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা আদায় করেছিলো ।** এই জাতির মানুষ এরপর থেকে ভারতের সেনাবাহিনীতে বেশি বেশি করে যোগ দিতে শুরু করে । শুরু করে নানান সমাজ সেবামূলক কাজে অংশ নেওয়া । এরপর ভারত স্বাধীন হয়ে, তাদেরকে শীলমোহর লাগিয়ে নতুন জাতিতে ভূষিত করে যার নাম যোদ্ধা জাতি । হা- হুতাশ

না করে প্র্যাকটিক্যাল সলিউশান । বিদেশের মতন । **লিভ ইন দা প্রেজেন্ট মোমেন্ট । অতীত বিড়ম্বনা আর ভবিষ্যৎ কল্পনা । তাই বর্তমানকে সুস্থ সবল করাতে ব্রতী হতে হবে । ঈশ্বর বলে কেউ আকাশ থেকে পড়বে না । নিজেদের বদলাতে হবে যদি সত্যিকারের শান্তি চাও । মহাপুরুষরাও তো মায়ের পেটেই জন্ম নেয় । গাছ থেকে পাকা আমের মতন টুপুস্ করে পড়ে কি ?**

কিন্তু এদের উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক থাকায় উচ্চজাতির অনেক লোকই এদের সাথে সামাজিক উপায়ে হওয়া বিয়েশাদিতে জড়াতে চাইতো না । অনেক অনেক আগে যখন এরা পিছড়ে বর্গ ছিলো তখন তারা অরণ্যের কুহকে মেতে দিন যাপন করতো । অর্থাৎ বনজ জিনিস কুড়িয়ে যেমন পাতা, মধু, ঔষধি তা হাটেবাজারে বিক্রি করে অথবা পশুপাখি মেরে - হাড় মাংস ছাল বেচে অথবা কাঠকুটো বিক্রি করে । **এই জাতের মেয়েই হল ছবি বাহার ।**

মেয়েটির বংশ এদের মধ্য ধনী ও বর্ধিষ্ণু । ওর বাবাও ছিলো খুবই পরোপকারি । অঞ্চলে ও নিজের কমিউনিটিতে নাম তার ভালো ছিলো । তাদের সম্পত্তিও অনেক । ধানী জমি , অন্যান্য ফসলের জমি ,

ধনসম্পদ, গাড়ি , বাড়ি সবই ছিলো । তারা তিন ভাই বোন । দুই বোন ও একদম ছোট একটি ভাই । দুধের শিশু সে । তখনই তার বাবা একদিন হঠাৎই মারা যায় এক রহস্যময় জ্বরে । আর ঠিক তখনই তাদের আত্মীয়দের রূপ বেরিয়ে পড়ে ।

বিরাট অট্টালিকা থেকে তাদের বার করে দেওয়া হয় । এমনকি বাস্তুচ্যুত পর্যন্ত করা হয় । এরপর দুয়োরাণীর মতন তার মায়ের অবস্থা হয় । মামাবাড়ির আশ্রিতা হয়ে যায় তার মা । তিনটে সন্তানকে নিয়ে । তার বাবা একজন পরোপকারী মানুষ হওয়ায় তার দরিদ্র মাকে বিবাহ করে । মায়ের বাড়ি খুব অবস্থাপন্ন নয় । ওর দাদু ছিলো গ্রামের স্কুল শিক্ষক । তার মৃত্যুর পর ছেলেপুলেরা নিজেদের মতন জীবন যাপন করছে আর সেখানে আরেক বোন নিজের তিন সন্তান নিয়ে এসে উঠেছে কিন্তু তারা বোনকে বিমুখ করেনি । নিজেদের একটি ঘরে থাকতে দিয়েছে । অবশ্যি সেই ঘরে আগে গরু থাকতো । বেশ বড় গোয়াল । সেটা সারিয়ে দিয়েছে । সেখানে ওরা থাকে । মন্দ নয় । তবে কোনো শৌচালয় নেই । এই গোয়ালঘর আদতে মামাবাড়ির চেয়ে বেশ দূরে । লাগোয়া নয় । তাই ওদের মাঠে যেতে হতো । মেয়েরা লজ্জা পেতো । বড় মেয়ে তো একবার টয়লেটে না গিয়ে

গিয়ে এতই অসুস্থ হয়ে যায় যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় । কিন্তু তার চেয়েও বড় বিপদ আসে এই মাঠ থেকেই । ভোরবেলায়, পাখি ডাকার আগেই লোকে মলত্যাগের কাজ সেরে নিতো । মেয়েটি হাসপাতালে ভর্ত্তি হবার পরে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে মাঠেই যেতে শুরু করে । একদিন সেখান থেকেই তার পিছু ধরে তার ফিউচার পতিদেব । মেয়েটিকে আহামরি কিছু দেখতে নয় বরং একটু ল্যাপা পোঁছা চেহারা । তবে খুবই ফর্সা আর ফিগার খুব আঁটসাট । খুব সুন্দর দৈহিক গঠণ । যাকে লোকে বলে সেক্সি ।

মলত্যাগ করতে গিয়ে প্রেম হয়ত কেউই শোনেনি । কিন্তু সেই থেকেই মানুষটি তাকে ফলো করা শুরু করে এবং ভাব এতদূর গড়ায় যে তাদের পাকা ঘর ও টয়লেট এবং স্নানঘর সবই এরপরে তৈরি হয়ে যায় । আর বিয়েও হয়ে যায় একদিন । লোকটি ছিলো পাকা ব্যবসাদার ।

হোটেল, মাছের আড়ৎ , সোনার দোকান , গার্মেন্টের ফ্যাক্টরি সবই তার ছিলো । উদ্দেশ্য ছিলো ঐ গোয়াল সংলগ্ন জমিটা দখল করা । ওর মামাগণ এই জমি বিক্রি করতে রাজি হয়না । তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি । বাপ্‌দাদার ভিটে । আর এখন দিদি ওখানে আছে । হলই

বা গোয়াল ! ঘর বানিয়ে দিয়েছে তো একটা বড়সড় ! কিন্তু লোকটি, ঐ এলাকায় নিজের একটা কিছু খাড়া করবে এই ছিলো তার মতলব । তো গুন্ডাবাহিনী না লাগিয়ে সে মেয়েটিকে ফাঁসিয়ে ফেলে । গরীবের মেয়ে জানে বাবা নেই কাজেই বিয়ে হওয়া মুস্কিল । নিজেই বিয়ে করে নেয় । লোকটির চেহারা ভালো । গড়ণ ভালো । আদবকায়দা খুবই ভালো । মিতভাষী । কিন্তু সত্য হল সে একজন ফেক্ মানুষ ; যে মুখোশধারী । সত্যের মুখোশ পরে আছে ।

মেয়েটির বাড়ির লোক জানতো লোকটি অবিবাহিত । কলকাতা থেকে এসেছে । বড় ব্যবসাদার । তাদের মতন গরীবের ঘরের মেয়েকে নিচ্ছে এই হল বিরাট ব্যাপার । কি আর খোঁজ নেবে তারা ?

কাজেই বিয়ে হয়ে যায় । মেয়েটি, যার নাম শুভা সেও তার স্বামীর সাথে বিয়ের পরে শহরে চলে যায় । ইতিমধ্যে তারা ভাইবোনেরা লেখাপড়া করেছে । সে তো এখন কাজ করে । তাদের পরিবারের নামের জন্য ও বাবার সমাজ সেবার জন্য লেখাপড়া ফ্রি করে দেয় সরকার । তাই ওরা মেধাবী বলে অনেক সুবিধে পায় । তিনজনই মোটামুটি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ে । তার মধ্যে ওর

ভাই সরকারি কাজে ঢোকে, বোন নার্স আর ও নিজে একটি স্কুলে অ্যাকাউন্টেন্ট । ও পড়তে ভালোবাসে তাই এম-কম অবধি পড়ে নিয়েছে । কিন্তু চাকরি পেয়েছে গ্রাজুয়েশানের পরেই কারণ ওর রেজাল্ট খুবই ভালো ।

বিয়ের পরে কাজ ছেড়ে দেয় কারণ ওর বর খুবই ধনবান ব্যাক্তি । বর বলে যে তুমি যে কোনো একটা ব্যবসা দেখো আমি খুশি হবো কিন্তু ও নিজেকে বরের প্রফেশানের সাথে জড়ায় না । তবে এরপরে একটা বিরাট ধাক্কা খায় । জানতে পারে যে তার বরের আরেকটা সংসার আছে , দুখানা বাচ্চাও আছে তার । কলকাতায় নয় তারা অন্য শহরে আছে । সেটাই বরের জন্মস্থান । আর পরিষ্কার বাংলা বললেও লোকটি আদতে বাঙালিও নয় । জাতে বিহারী । পদবি সিংহ শুনে ওরা ভাবে যে বাঙালি কিন্তু আসলে সে বিহারী । এরপরেই গোলমাল আরম্ভ হয় । প্রথম স্ত্রী এসে হাজির হয় । ছেলেপুলে নিয়ে ।মারধোর । গন্ডগোল । পাড়ার দাদাদের আগমণ । আর আউট অফ কোর্ট সেটেলমেন্ট । অর্থাৎ মেয়েটি আলাদা হয়ে চলে আসে ওর মামাবাড়ি আর লোকটি ওকে খোরপোষ হিসেবে টাকা দিতে বাধ্য হয় একটা মোটা রকমের অর্থ একসঙ্গে ।

শুভার মা খুব কাঁদে সেদিন । বলে, কি এমন করেছি যে ঠাকুর আমার এত পরীক্ষা নিচ্ছে ? মেয়েটার জীবনটা শেষ করে দিয়ে তোমার শান্তি হল হে ভগবান ? আর কি কি দেখাবে তুমি ?

সত্যি আরো অনেক কিছুই হয়ত দেখা বাকি ছিলো তাদের ! আর গল্প শুরু এখান থেকেই আসলে ।

এদিকে রাত গাঢ় হয়েছে । চারিদিকে অমানিশার ঘন কালো থাবা । দূরে শেঁয়ালে হাড়হিম করা ডাক । বুনো ফুলের সুগন্ধে এক মাদকতা । মহুয়া গাছের ছায়ায় যেন কার একটা অবয়ব দুলছে ! আকাশে অন্ধকারের মধ্যেও মেঘের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে , ভেসে ভেসে যাচ্ছে ।

সত্যি মানুষ মরে যায় তবুও কিছুই ফুরায় না । সবই একই থাকে । আর এই মহাজগৎ সবই দেখে । তার মহা আঁখি মেলে । উপভোগ করে । কিসের আশায় কে জানে ! হয়ত সাক্ষী হয়ে থাকে ঈশ্বরের দরবারে কথা কইবার জন্য ।

আসল গল্প এখান থেকেই শুরু হয় । আমদের শুভা এই বিচ্ছেদের পরে একটা কম্পিউটার কোর্স করে নেয় এইসব হিসেব নিকেষ সংক্রান্ত । তারপরে ওর এম-কম

ও এইসব ডিগ্রী নিয়ে ও গুজরাটে চলে যায় একটি সংস্থায় সেই অ্যাকাউন্টাটের কাজ নিয়ে । জুনিয়ার হিসেবরক্ষক । স্মার্ট মেয়ে । বিবাহ বিচ্ছিন্না । সেক্সি । সুন্দর ফিগার । সোনার মতন বরণ । মুখটা একটু লেপাপোঁছা । এই হল তার বর্ণনা । বয়স কম । ২৬-২৭ হবে । কাজেই ভক্তের কমতি ছিলো না । কেউ কেউ একধাপ এগিয়ে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডে আহবান করে ।

কিন্তু শুভা সেরকম মেয়ে নয় । খুবই রক্ষণশীল প্রকৃতির মানুষী । তাই একাই থাকে । কিন্তু তার মা , যামিনী দেবী খুবই চিন্তিত এই মেয়েকে নিয়ে । একা থাকে প্রবাসে । খেটে খায় । কাজ না করলে চলে । খোরপোষের টাকা এতটাই আছে কিন্তু সে বলে , মা কিছু তো একটা কাজ চাই ! বসে বসে কি করবো ? আর পড়েছি , ভালো ফল পেয়েছি , আর আমার এসব কাজ আর অঙ্ক করতে ভালোলাগে । বাইরের জগৎ ভালোলাগে । ঘরে বসে বসেও বোর হয়ে যাবো ।

যামিনীও আর মেয়েকে কিছু বলেনা । জীবনটা নষ্ট করে দিলো একটা ফালতু লোক এসে কিছু টাকা কামাবার মতলবে । কিছু জমি হাতাবার জন্য এইসব । আরে তোর

তো সম্পত্তি কম নেই , ব্যবসাও কম নেই । আর কত চাই ? সারা দুনিয়াটা এইবার গোগ্রাসে গিলে নে ।

খালি খাই খাই , আগুনের মতন । এত খাবার পেটে সইবে না ধম্মে সইবে ?।আরেক হয়েছে এই শপিং মল । সারাটা জগৎ এরা শপিং মলে ঢেকে ফেলবে এবার । ছোট ছোট দোকানি ও ব্যবসাদারের আর কোনো ইজ্জৎ নেই ভবিষ্যৎও নেই । সবাইকে এবার মাওড়া হতে হবে । বেওসা আর রং চং-এ জামাকাপড় । যামিনী সেলাই করে । জামা বানায় । শাড়ি থেকে হল সালোয়ার কামিজ , সবাই এগুলো সেলাই করে । ভালো তা পাঞ্জাবী পোষাক এগুলো , এবার সবাই সাহেব হবে । এমন পোষাক সেলায় যে কহতব্য না । আরে পাঞ্জাবী হল এবার অন্য হোক্ মেখলা পর, ঘাঘরা পর তা নয় । এদের গ্রামেই এমন । এখন সবাই মেমদের মতন পোষাক বানায় । লোকে অবশ্যি বলে, মাসী তুমি পারোনা তাই । কিন্তু তা নয় । হালফ্যাশানের কাজ সেও পারে তবে কত সুন্দর সুন্দর পোষাক তো আমাদের অন্য রাজ্যেও আছে সেগুলো পর আগে তারপর বিদেশী পোষাক পরবি । নিজের মেয়েরাও একই । তার কথা কেউ শোননা । কাকস্য পরিবেদনা । তাও ভালো ছেলেটা গর্মেন্ট সার্ভিস পেয়েছে (গভর্মেন্ট সার্ভিস) সেটা যামিনীর মনের ইচ্ছে ছিলো যা

ভগবান পূরণ করেছেন নাহলে কি যে হতো । আজকাল এত চাকরি যায় ! এই আছে ; এই নেই । কোভিডে কত লোকের কাজ গেছে । উহ্ !

মায়ের চিন্তা ছাড়া আর কোনো অসুবিধে ছিলোনা কিন্তু পরে বন্ধুরা খুব ধরলো যে একটা বিয়ে করেই ফেল । একা একা কি করে জীবন কাটাবি ?

নাহলে একটা শিশুকে অ্যাডাপ্ট করে নে । সহকর্মীরাও অনেকেই অতিউৎসাহী থাকায় কনফিডেন্স বাড়ে তার যদিও সে বিবাহ বিচ্ছিন্না । গ্রামের মেয়ে তাই সেকেলে মনোভাব তার । তার মা জন্মের সময় নাম রাখে কামিনী । স্কুলের খাতায় সেই নামই ছিলো । যামিনীর মেয়ে কামিনী । তার মায়ের প্রিয় ফুলের নামে মেয়ের নাম । কিন্তু স্কুলের এক টিচার, মণিমালাদি বললো , বড্ড সেকেলে নাম । তখন বদলে শুভা করে দেয় ।**কাজেই নাম দেওয়া থেকে শুরু করে ; সে একটু সেকেলে আর কি ।**

এরপর ওর বন্ধুরাই ডেট যোগাড় করতে থাকে । তার চেহারাতে একটা সেক্সি ব্যাপার ছিলো । সানগ্লাস পরে , আধুনিক পোষাকে তাকে একেবারে মনোলোভা মনে হতো । অনেক পুরুষই তাকে কামনা করতো । আর মেয়েটিও ভালো । ভালো রোজগার করে । সাঁতারে যোগ দিয়ে প্রাইজ পেয়েছে কারণ গ্রামে বিশাল নদীতে সাঁতার কেটে অভ্যস্থ । কম সময়ে নদী এপাড় ওপাড় । কোলাঘাটে, জেলে নৌকো ভাড়া করে তাতে কাজিনদের সাথে সারারাত জেগে ইলিশ মাছ ধরেছে । সাঁতার শিখতে কোনো **ছুইমিং ফুলে** যায়নি কোনোদিন ।

গাছের কোটর থেকে পাখির ছানাকে বাঁচিয়ে এনেছে সাপের মুখ থেকে । সে এলাহি ব্যাপার । স্মার্ট মেয়ে ।

কেবল নগরেই অপ্সরাদের বাস কে কয় ? এহল নগরপাড়ের কোনো ময়নাগাঁয়ের ময়না পাখি ।

সে যাইহোক্ না কেন ঘটনা হল ডেট তো যোগাড় হতে লাগলো ; তা প্রায় গোটা ৮জনকে সে সময়ও দিলো আর তার মধ্যে ৬খানা বিয়ে অবধি গড়ালো কিন্তু প্রতিবার যখন বিয়ের কথা বলার জন্য বাড়ির লোক অবধি ব্যাপারটা গড়ায় ,তারপরই পাত্রর তরফ থেকে বিয়ে ভেঙে যেতে শুরু করে । এইরকম হয় মোট ৬ বার ।

তারপর আরো দুবার তার লোক মারফৎ সম্বন্ধ আসে । কারণ ততদিনে লোকে জানতে পেরেছে যে সে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চায় । সেই দুই জায়গাতেও কথা অনেক এগিয়ে গিয়ে পাত্রর দিক থেকে ভেঙে দেওয়া হয় । কোনো কারণ না দেখিয়ে ।

এই আমাদের তাড়া নেই , পাত্রের বাবার অপারেশন হবে, বোনের আগে বিয়ে দেবো , আমরা আগে কৈলাসে তীর্থ করবো তারপরে বিয়ে দেবো , ছেলে আমেরিকা যাবে বলছে এখন বিয়ে করবে না এইসব । সন্দেহটা তখনই দানা পাকে । খবর নিতে শুরু করে ওরা । **এবং জানা যায় যে প্রতিটা ক্ষেত্রেই একজন লোক গিয়ে গিয়ে মেয়ের সম্পর্কে নিন্দে রটিয়ে আসছে ।** সব জায়গায় নিজেরা তো যায়না । চেনাশোনাদের জিজ্ঞেস করে আর অন্য ক্ষেত্রে গোয়েন্দা লাগায় । **জানতে পারে বিশদে যে বলা হয় এইসব, মেয়ে চরিত্রহীনা , মদ্যপ ,একটি নারী সারমেয় , তুকতাকে অভ্যস্ত , আগের স্বামীকে বেদম প্রহার করতো , শাশুড়িকে বিষ দিয়ে মারতে গিয়েছিলো , শ্বশুরকে হত্যা করতে যায় সম্পত্তির জন্য তাই ডাইভোর্স হয়ে গেছে আরো যতরকম সম্ভব কুকথা বলে আসে ঐ একটি লোক । একটি সুঠামদেহী , সুপুরুষ যুবক ।** সে যে কে কেউ জানেনা । যখন কেউ জিজ্ঞেস করে তখন

বলে যে আমি ওর ভাই । আত্মীয় হই । নিজের বোন বলে চেপে যাবো তা নয় , বরং বলছি- না না এখানে বিয়ে করলে সর্বনাশ হবে । বাজারে আর মেয়ে পেলেন না আপনারা ?

প্রথমে যামিনীরা মনে করে এটা ওদের আত্মীয়দের কীর্তি । কিন্তু পরে খবর নিয়ে জানে যে নাহ্ , ওরা কেউ এর সাথে যুক্ত নয় আর ওদের বাড়ি এখন এই বয়সী কেউ নেই যে এরকম দুষ্টুমি বা শয়তানি করতে পারে । এই বয়সী সবাই বাইরে কাজ করে । তারা বিদেশে বা বাংলায় । আর তারা করবে বলে মনে হয়না যা শুনেছে । ওদের জ্ঞাতিগুষ্টির সমস্যা ঐ জমিজমা নিয়েই ছিলো যা ওরা পেয়েই গেছে আর তাও আগের প্রজন্মের লোকেরা । জ্যাঠা-জেঠিমা এরা আর তারা মারা গিয়েছে সবাই । পরবর্ত্তী প্রজন্মের লোকেরা এগুলি করার মতন মানুষ নয় । তারা খোলামনের লোক ও নব্য সমাজের যুবক যুবতী । আর কারো সময়ও নেই এত বরং শুভার বিয়েতে ওদের ডাকা হয়নি বলে ওরা ব্যথিত। কাকা মানে শুভার বাবা যতদিন জীবিত ছিল ততদিন সবাই একসাথে ছিলো । হেসেখেলে বড় হয়েছে । কাজেই ওকে দিদিভাই বলে ওরা । শর্টে হাসিদিদি বলে । কারণ শুভা কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়তো তাই । সেই হাসিদিদির দ্বিতীয়

বিয়ের ক্ষেত্রে কেউ এমন করবে ভাবা যায়না । বরং ওরা চায় আবার একটা বিয়ে হোক্ । এবার ধুমধাম্ করে দেওয়া হবে আর সে কোন বাড়ির মেয়ে সেটা সবাই দেখবে ।

তাহলে কে করছে এগুলো ?

যামিনী ওদের গ্রামের পুরুৎ মশাই এর কাছে যায় । অনেক বয়স তার । ছোট থেকে দেখছে । যামিনীর বিয়েও ইনিই দিয়েছেন । নাম কাশীবাবু । কাশীরাম চক্রবর্ত্তী । যামিনী ওনাকে কাকা বলে ।

এই কাকাবাবু জানান যে এই যুবকটি আদতে একটি মানুষের আত্মা । আর সেটা শুভার খুবই পরিচিত কারো আত্মা যে চায়না শুভার আবার বিয়ে হোক্ ।

কিন্তু সেটা কে হতে পারে ?

পুরুৎমশাই জানান যে এটা হল শুভার আগের স্বামীর আত্মা । সে অপঘাতে মৃত । তার আত্মা সৎগতি পায়নি । সম্ভবতঃ তার কোনো পিন্ডদান ইত্যাদি কেউ করেনি কোনো কারণবশতঃ তাই সে এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা তারা **কালীর গুপ্ততন্ত্র** এর সাথে জড়িত কোনো পরিবার যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কালী মায়ের

কিছু শক্তিকে অর্থাৎ **প্রেত-ডাকিনী এসবগুনোকে** ডেকে অন্যে লোকের ক্ষতির জন্য ব্যবহার করে থাকে । তাতে করে এরা মারা যাবার পরে মুক্তি পায়না আর এইভাবে আত্মা ঘুরে বেড়াতে থাকে কালচক্রের ভেতরে । হয়ত লোকটি এইসব কুচক্রে দারুণভাবে যুক্ত ছিলো ।

শুভা পরিস্কার বুঝতে পারে যে দুটোই হয়ত সত্যি । লোকটি কেবল শয়তানই নয়, একটি জঘন্য চরিত্রের কালসাপ যে মানুষের ক্ষতি করেই ক্ষান্ত হয়না তার পেছনে ঘুরে ঘুরে তাকে খতম্ করে দিতে নিজের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত ঢালতে উদ্যত হয় । এই কুচক্রী ও পশুরও অধম মানুষটি কেউ নয় সেই লোকটি যে একদিন ছলেবলে কৌশলে তার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলো । যামিনীও সবই বুঝতে পারে ।

পুরোহিত কাকাকেও সবই খুলে বলা হয় । তখন কাশী বাবু বলে ওঠেন যে উনি এইরকম কাজ করেন না , এইসব পিশাচ, ডাকিনীর কাজ । কিন্তু ওনার এক পরম হিতকারী বন্ধু আছেন, উনি করেন কিন্তু উনি বাস করেন শ্মাশানে । এক ঘন বনে । সেখানে গেলে উনি করে দেবেন । উনি পিশাচসিদ্ধ বাবাজী । একটু ভয়াবহ রূপ তাঁর । পরণে উজ্জ্বল লাল কাপড় । মাথায় জটা । কোমড়

অবধি । একটা চোখ অন্ধ । ঠেলে বার হয়ে আসছে । নাকের ফুটো খুবই বড় । কেমন কঙ্কালের মতন দেখতে তাঁকেও ।

কিন্তু অমানিশায় , একা জঙ্গলে বসে কাজ করাতে হবে । যদি পারে শুভা তাহলে হয়ে যাবে । সেই আত্মাটি/লোকটি পেছন ছেড়ে দেবে তার কারণ ঐ তান্ত্রিক হলেন খুবই ভালো সাধু । আজকাল এরকম শুদ্ধ তান্ত্রিক পাওয়া মুস্কিল । বেশিরভাগই অন্য ধান্দায় এইদিকে আসে ।

একদিন সময় সুযোগ মতন শুভা ও তার মা ওদের পুরোহিত কাকার সাথে গেলো ঐ সাধকের কাছে । লোকটি থাকেন একটি বনের মধ্যে । একটা চোখে দেখেন না । সেটা ঠেলে বার হয়ে আসছে । নাকের ফুটোগুলো এত্তো বড় বড় যেন মনে হচ্ছে কঙ্কালের মুখ, আর মাথাটি ন্যাড়া নয় জটা সমৃদ্ধ । লাল পোষাক । বনের মধ্যে একটি দালানে বাস করেন সেটাও খন্ডহর ধরণের । ভাঙা দালান । তারই পাশে একটি ঘর । খুবই ছোট । এই ঘরেই আরাধ্যা তার দেবী মা , **শক্তিরূপেন সংস্থিতা । মায়ের নাম কহরবুরু । উত্তর ভারতের এক**

অনামী দূর্গম বনবনান্তরে আবৃত স্থান , ঝাঁঝা থেকে এই মাকে এখানে আনেন উনি । মায়ের নামখানা কেন কহরবুরু তা কেউ জানেনা । হতে পারে যেখানে উনি পুজিতা হতেন সেই গ্রামে এক জাত বাস করতো কহর নামে । তারা লোহার কাজ করতো । এদের মধ্যে পুরুৎদের ওরা বুরু বলতো । হয়ত সেখান থেকে কোনোভাবে এই নাম প্রচলিত হয়েছে । তবে ঝাঁঝা থেকে এই মাকে এখানে আনা হয় সাধনার জন্য । এই রূপ হল শক্তির রূপ অর্থাৎ মা দুগ্গাও হতে পারে আবার কালীও বলা চলে । সারা ভারতে ও নেপালে কতনা শক্তির পুজো হয় । মাকে দেখতে খুবই অদ্ভুত ।

কেবল মাথাটা আছে । বড় বড় সাদা সাদা চোখ । কমলা মাথা । কালো জটাধারী । গলা থেকে বার হয়ে এক কালো সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে বসে । তার ওপরেই মায়ের বসে থাকা । সেটাই তাঁর দেহ । আর দেহ ঢাকা থাকে একটি গাঢ় লাল শাড়িতে । শাড়িখানা ক্ষুদ্র । রোজ রাতে মা লীলায় বার হন । তার প্রমাণ প্রতিদিন সকালে শাড়িতে চোরকাঁটা লেগে থাকে যা সাধক মশাই পরিষ্কার করে দেন । আবার পরের দিন দেখা যায় । অথচ আশেপাশে কোনো চোরকাঁটার বন নেই । সাধক নিজে হাতে সব সাফ করে রাখেন । আর মা নিজে ছাড়া কেই

বা যাবেন ? শাড়িতে কি করে এগুলি আসবে রোজ রোজ ? কেউ তো এখানে থাকেনা ।

এই সাপটি আদতে কূলকুন্ডলিনী । মায়ের এখানে পুজো হয় রক্তের । সেই রক্ত আসে বলি থেকে । রোজ এখানে বলি হয় । কোনো না কোনো পশুর । ছাগল , মোরগ , শেঁয়াল , হরিণ , ভ্যাড়া, বেজি যা মেলে ।

এই বলি প্রথা শুরু হয় এই মাকে এখানে আনার পরেই । একটি শিশুকে , মানব শিশুকে মা ধরে আনতে বলেন । পাশেরই গ্রাম থেকে । এই সাধক তাকে নিয়ে এলে মায়ের আদেশে তাকে বলি দেওয়া হয় । কিন্তু বলির পরেই যখন তার রক্ত দিয়ে অর্চনা শেষ হয় তখনই শিশুটি জেগে ওঠে । আজব কান্ড । তারপর থেকেই এখানে নিত্য বলি হয় কিন্তু রক্ত পুজোর পরেই নাকি পশুটি বেঁচে উঠে বনে মিলিয়ে যায় । এইরকম চলে আসছে অনেক বছর ধরে তাই মা কহরবুরুকে অনেকে খুবই জাগ্রত এক শক্তির রূপ বলে মনে করে থাকে ।

এই মন্দিরেই ঐ সাধক যাকে লোকে লালঠাকুর বলে সম্বোধন করে থাকে ওনার আদেশে শুভাকে গভীর রাত্রে নগ্ন হয়ে বসতে হয় । সেদিন একটি বেজিকে বলি দেওয়া হয় । তারপর পুজোয় বসেন লালঠাকুর । বাইরে অর্থাৎ

মন্দিরের বাইরের চত্বরে অন্য অনেকে অপেক্ষারত যেমন যামিনী , শুভার ভাই ও কিছু বন্ধুরা । মাকে রক্তদান করে সেই রক্তের পুজো হতেই এক পুরুষের অবয়ব ফুটে ওঠে মায়ের কৃষ্ণ অঙ্গের পাশে । সেই ধোঁয়া ধোঁয়া ধোঁয়া লোকটি আর কেউ নয় শুভার আগের স্বামী । লোকটি মাতালের মতন টলছিলো ।

তাকে প্রশ্ন করতে সে প্রথমে অস্বীকার করে তারপর মায়ের পুজোর ফুল ও বেলপাতা ইত্যাদি তার দিকে ছুঁড়ে দিতেই সে হা হা করে সত্য উগড়াতে শুরু করে । তার বক্তব্য হল এই যে , এই শুভা তারই স্ত্রী । এই জড়জগতের এই একটি কাগজের সইতে কিছু বদলায় না । তার প্রথমা স্ত্রী বরং তার কেউ নয় । মনের মিল না হলে বিয়ে করে মন্ত্র উচ্চারণ করে নাকি কোনো লাভ নেই ; শাস্ত্রে আছে । আগের বিয়েটা তার বাবা ও মা জোর করে দিয়ে দিয়েছিলো । মহিলাটিকে তার পছন্দ ছিলো না মোটেই । কিন্তু সহবাস করে সন্তান হয়ে যায় । শুভার সারল্য তার মনে গেঁথে যায় । যদিও একটি কদর্য কারণেই সে ওদের বাড়িতে যায় কিন্তু পরে শুভাই হয়ে যায় তার একমাত্র ভালোবাসা । জীবনে সে অনেক নারীসঙ্গ করেছে । রমণী আর চুরুট তার কাছে বদলানোর জিনিস কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে তার মনের অতলে

এক বিপ্লব এসেছে যে সত্যি মানুষ এত সরলও হতে পারে আজকের দুনিয়াতে ? এত সহজেই কাউকে বিশ্বাস করতে পারে ? ঐ সারল্যের মাদকতাই তাকে ঘায়েল করেছে । কোনো অস্ত্র বা শস্ত্র নয় । তার মতন এক জটিল মনের জঘন্য মানুষের কাছে এহল স্বর্গের পরী বা পারিজাত হাতে পাবার মতন । তাই সে একে যেতে দিতে পারেনা । কারণ এই মেয়েটি হল তার প্রেম । আর প্রথম প্রেমকে কে কবে ভুলেছে ?

এইসব যুক্তি তক্কো মানুষের হলে ঠিক ছিলো কিন্তু একটি মুক্তি না পাওয়া আত্মার কাছ থেকে এইরকম কথা মনে হয় লালঠাকুর আগে কোনোদিন শোনেননি । তবুও বলেন , এটা আমার মতে প্রেম নয় । কারণ প্রেম মানে প্রসার । তুই যা করছিস্ এটা হল সংকোচন ।

নিজের দিকে টেনে মেয়েটিকে ব্যাথা দিচ্ছিস্ , আর ভালোবাসলে কেউ আদরের জিনিসকে কষ্ট দিতে পারেনা । সরল মেয়েটিকে তুই ব্যবহার করছিস্ নিজের স্বার্থে - নিজের আরামের জন্য । তোর মতন মূর্খ ও শয়তান লোক আমি আগে কোনোদিন দেখিনি । সাধনা করে আমার চুল দাঁড়ি গোঁফ সব পেকে গেছে কিন্তু এরকম ঘাওড়া আত্মার সংস্পর্শে আমাকে কহরবুরু মা আগে

কোনোদিন আনেননি । তুই ওকে ছেড়ে চলে যা । ওকে একবারও জিজ্ঞেস করেছিস্ যে ও তোকে চায় কিনা ?

সাথে সাথে নগ্ন শুভা যার লালঠাকুরের সামনে এইভাবে বসতে খুব লজ্জা করছিলো কিন্তু বসতেই হল কারণ এটা নীলছবির শুটিং নয়, এহল মায়ের কাছে শক্তি রূপে বসা। পর্ণোমোচী বৃক্ষের মতন । ঝরিয়ে সমস্ত বল্কল মানুষ আবার তার আদিম রূপ ফিরে পায় ।

তবুও শুভা কিন্তু বড় বড় গাদা ও জবা ফুলে মালাগুলো যে পরেছিলো সেগুলো এতটাই পরেছিলো যে প্রায় সবই ঢাকা পরে যায় । স্তন, ঊরু, জঙ্ঘা , পশ্চাৎদেশ !

আদতে দেহের চেয়েও বেশী যেটা এখানে লক্ষণীয় তাহল মনের খোলস খুলে ফেলা । লজ্জাই যখন করছে তখন বোধহয় এইক্ষেত্রে পোষাক পরে বসাই ভালো ।

তো যাইহোক্ মায়ের যজ্ঞের বিভূতি , মন্ত্র, পুষ্প , চালপোড়া এইসবের ঘা খেয়ে খেয়ে আত্মা শেষপর্যন্ত রাজি হল বৈতরণীর ওদিকে যেতে । তবে একটি শর্তে যে স্বয়ং মা তাকে ক্ষমা করে দেবেন এইসব কর্মের জন্য । তাতে মা কহরবুরুর তরফ থেকে লালঠাকুরকে জানানো হয় যে কৃতকর্মের ফল লোকটিকে ভুগতেই

হবে । কেউ কর্মের ফলকে আটকাতে পারেনা তা ভালো হোক্ বা মন্দ । তবে মায়ের চরণে যারা মাথা রাখে তাদের কর্মভার মা অনেকটা কমিয়ে দেন । তাই বুঝি মহাপুরুষেরা বলে গেছেন যে সৎ ও শুদ্ধ চিন্তা করো কারণ চিন্তা থেকেই শুরু হয় কর্ম । আর একবার হয়ে গেলে সেই কাজ তো ফেরানো যায়না । তাই ভাবিয়া করিও কাজ , করিয়া ভাবিও না ।

এরপর নিয়মিত পুজোর মতন সব শেষ হয় ।

প্রেতটি যখন চলে যায় তখন পাশেই একটি বড় গাছ ভেঙে পড়ে । আর শুভার সারাটা দেহে একটা বিদ্যুৎ খেলে যায় । যেন যাবার আগে কোনো শত্রু তার গায়ে ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে গেলো ।

প্রায় আ আ করে পড়েই যাচ্ছিল উলঙ্গিনী শুভা , লালঠাকুর মা মা করে তাকে ধরে ফেলেন । ততক্ষণে বাইরে বসে অপেক্ষা করা তার লোকজন ভেতরে প্রবেশ করেছে । সবাই এসে তাকে তুলে ধরে ।

পোষাক পরে নেয় সে । সবাই মিলে প্রসাদ খায় আর একসাথে পাড়ি জমায় এক নতুন দিগন্তের দিকে , স্বপ্ন ঝরানো মাধবী ক্ষণের সন্ধানে ।

Information related to my book:

From Wikipedia, the free encyclopedia-

1. Halaguru

Halaguru or Halagur is a town in the southern state of Karnataka, India.

Halaguru is situated at NH 948 (previously NH 209) and state highway KA SH 94. It is one of the oldest towns in Mandya district. It is 82 km from Bangalore the capital city of Karnataka, 60 km from Mysore, 50 km from Mandya, 41 km from Ramanagara, 10 km from

Sathanur, 27 km from Kanakapura, 29 km from Channapatna and 90 km from Chamarajanagar.

Halaguru had a history of seven great blacksmiths who had ruled the town;around 1000 people belong to the Vishwakarma community and they are living in the same street, Achar Street. Most of them are goldsmiths. This is the only place in Karnataka where Vishwakarma people are found in majority.

---

2. Kuttichathan:::

Kuttichathan is a spirit in the folklore of Malabari Hindus, depicted as a portly adolescent boy, sometimes described as having a *kutumi*. Kuttichathan's tricks (such as turning food into excrement, and beds turning into beds of thorn) cause great trouble to his victims but never do serious harm. He is said to demand food in exchange for freedom from his harassment. Most of the chathan temples in Kerala belong to the Kalari Panicker and Thiyya castes.

Some Hindus in Malabar believe that sacrificing a cockerel on a regular basis with the correct incantations will appease Kuttichathan, and that he will otherwise terrorize their families. Kuttichathan also appears in pop culture, such as in the 1984 Malayalam film *My Dear Kuttichathan*.

See also Kuttichathan Theyyam

==========

3. Riksundar Banerjee or Riksundar Bandyopadhyay (Bengali : ঋকসুন্দর ব্যানার্জী), (born on 9 August 1987) is a fiction writer

from Kolkata, West Bengal, India.

He earned an post graduate degree (M.A.) in Bengali Literature from Jadavpur University.

He has been awarded Ph.D at The University of Burdwan on Uncanny in Bengali Literature: Traditions and Evolution (Bengali: "বাংলা গল্প সাহিত্যে ভূত: পরম্পরা ও পরিবর্তমানতা ") in 2018.

He has jointly presented the paper on 'The Algorithm Of Ghostliness' at York 2019, Bond University, July 2019

He has been writing articles in several magazines and news papers, such as Anandabazar Patrika and Ei Samay.

Among his other works there is the movie Stuck and a discussion on effects of AI and supernaturals on humans, "Stuck Discussion", held in Triguna Sen Auditorium, Jadavpur University. He is also one of the co-writers of the screenplay and dialogues for the film *Bhotbhoti* (Whispers of Mermaids).

Riksundar's book 'The Book of Indian Ghosts' received praise in a published review on 'The Hindu' newspaper.

---

4. Tim the Yowie Man is an Australian writer, author and cryptonaturalist who was born in Canberra, Australian Capital Territory.

Born Timothy Bull, TYM has changed his name by deed poll. He is an Australian National University graduate.

Tim the Yowie Man claims to have seen a "yowie", an entity from Australian folklore that supposedly resides in the nation's outback. He saw it while bushwalking at Mount Franklin in the Brindabella National Park in 1994. Since then, Tim the Yowie Man has investigated yowie sightings and other paranormal phenomena across Australia and internationally. He also writes regular columns in various newspapers including *The Canberra Times* and *The Sydney Morning Herald*.

In 2012, artist Barbara van der Linden painted Tim's portrait as part of her *Faces of Canberra* series, for exhibition during Canberra's centenary year in 2013. He continues to live in Canberra with his family.

He has acted as a location and historical advisor for international television programs on unusual phenomena and has featured in documentaries about Australian and international mysteries. He was even an informant for foreign press when Survivor was filming in the Australian outback. He is a member of the Australian Society of Travel Writers, and has hosted a national travel radio show and is a ghost-tour guide. He also has his own YouTube channel that covers mysteries, cryptids, and urban legends.

5. **From Geological sites of New South Wales : http://www.geomaps.co**

m.au/scripts/mysteryba y.php

On 10 October 1880, at a bay near Bermagui in NSW, five men vanished in what became one of Australia's most baffling sea mysteries. Within a few hours of their reported disappearance an intensive search commenced, and continued for many months, but no trace of the men, or any clues to the mystery of their disappearance were ever found.

Background

In 1880, gold was discovered at a site in NSW called Montreal (see Montreal Goldfield elsewhere on this site) near Bermagui. The Mines Department sent Lamont Young, one of its geologists, to inspect and report on the find. He was accompanied by a German friend, Louis Schneider, a botanist.

After arriving at Batemans Bay by steamer, Lamont secured a boat and a crew of three to row them to the Montreal Goldfield. The crew included the boat's owner, Thomas Towers of Batemans Bay, and two of Towers' friends: William Lloyd and Samuel Casey. However rather than going directly to the Montreal Goldfield, Young apparently changed his plans: after 4 pm on the Saturday of his arrival, he was never seen again. At about 7am on the Sunday morning, his rowing boat, a green eight-metre vessel, was seen by several residents leaving Bermagui and others noticed it as it moved slowly north along the coast.

At about 4pm that afternoon, a man riding along the coast found the boat on the rocks known locally as Mutton Fish Point, about fifteen kilometres north of Montreal, but

there was no trace of any of the men who had left that morning.

Police, who hurried to the scene and examined the boat, noted that it had been carefully steered through about 70 metres of jagged rocks. There were four large holes in the hull but the planking had been stove out, not in. On the seats were bait, a pocket knife, pipe and tobacco, crumbs and other food. There was also a bag of potatoes and a bag of mixed personal articles like clothing, bedding, tools and sundries. The anchor and stern lines were missing but some large stones had been placed in the boat. Scattered on the beach nearby were a pipe, sheath knife, an axe and shovel. Other items which may have been linked to the mystery were three mother-of-pearl studs, a portion of a meal and three cigar butts. Young, Schneider and the three boatmen were not at Bermagui and were never heard of again despite subsequent searches, rewards, government inquiries and wide media coverage.

The name 'Mystery Bay' is the result of this bizarre event and a memorial at Mystery Bay was unveiled on 10 October 1980 on the centenary of the incident.

6. Vana Mohini

If evil sprits in Sri Lanka were to ever enter a popularity contest, Vana Mohini, or Mohini for short, is sure to win. Dressed completely in white with long black hair fluttering in the breeze and always carrying a baby, she's known to hail down solitary travelers, usually men, to ask for help. This is where the stories diverge—some claim that she asks the men to hold the baby for a moment, and the men who peer into the bundle die instantly. Others claim that she comes close enough for the men to look into her eyes, after which she disappears and the men are

driven to madness, often dying within a week. A few others claim she gets into the passenger seat of the car and causes a horrific crash. Some even believe that the briefest of glances at Mohini result in instant and painful death. Whichever the version, there is only one end for those unlucky enough to stop at night for Mohini.

With a name literally meaning "delusion," Mohini appears to have roots in Hindu mythology. With a reputation as a Femme Fatale, she was the only female avatar of the god Vishnu. She was known to drive her lovers to madness, pushing them towards their ultimate death. Early accounts of Mohini in Sri Lanka portray her as an evil forest fairy, but the legend evolved over time, describing her as a demon preying on lone men traveling at night.

Despite her reputation for killing those who come in to contact with her, almost everyone knows a "lucky traveler" who was smart enough not to stop for this solitary woman in white, thereby narrowly escaping her clutches.

7. Orang Minyak

According to Malay legend, Orang Minyak is a creature that abducts young women by night. Supposedly, the creature is able to climb walls and grab victims while evading capture due to its slippery coating. The coating was first described as consisting of hair oil, before later stories evolved into it being covered in coconut oil and soot; the genre movies have it covered in crude oil reflecting the local industrial advancements at the time. According to some folklorists, the Orang Minyak has been alternately described as appearing naked, or wearing "a black pair of swimming trunks". A number of stories describe the Orang Minyak as a rapist that only targets

virgins. The Orang Minyak has been traditionally blamed for rapes, beginning in the 1950s, and superstitious Malay female students would attempt to ward off the creature by donning sweaty clothing "to give the appearance of someone who had just been with a man".

Some versions of the legend hold that the Orang Minyak is an evil human warlock rather than a supernatural creature. Science writer Benjamin Radford described the tales as "rooted in myth and folklore" and characterized the creature's supposed abilities as "implausible". According to Radford, "if a person actually covered himself that way, greasy hands and feet would make it difficult to turn doorknobs or run around, not to mention crawl up the sides of buildings or grab a struggling captive".

Malaysian newspapers occasionally report claimed sightings of the Orang Minyak. In 2012, the residents in Kampung (Village) Laksamana, in Gombak, Selangor, Malaysia, claimed to have seen and heard the creature in the vicinity of the Pangsapuri Laksamana and Jalan Laksamana. Several years earlier, local newspapers carried sensational reports of a knife-wielding rapist covered in oil, ostensibly in imitation of the Orang Minyak.

Singaporean writer Yogesh Tulsi comments that the orang minyak's depictions slathered in crude oil represents traditional ways of life ruined by a "horrific petromodernity".

8.Taipans are snakes of the genus *Oxyuranus* in the elapid family. They are large, fast-moving, highly venomous, and endemic to Australia and New Guinea. Three species are recognised, one of which, the coastal taipan, has two subspecies. Taipans are some of the deadliest known snakes. Species of this genus possess highly neurotoxic

venom with some other toxic constituents that have multiple effects on victims. The venom is known to paralyse the victim's nervous system and clot the blood, which then blocks blood vessels and uses up clotting factors. Members of this genus are considered to be among the most venomous snakes in the world based on their murine LD_{50}, an indicator of the toxicity on mice. The inland taipan is considered to be the most venomous snake in the world and the coastal taipan, which is arguably the largest Australian venomous snake, is the third-most venomous snake in the world. The Central Ranges taipan has been less researched than other species of this genus, so the exact toxicity of its venom is still not clear, but it may be even more venomous than the other taipan species. Apart from venom toxicity, quantities of venom delivered should also be taken into account for the danger posed. The coastal taipan is capable of injecting a large quantity of venom due to its large size.

In 1950, Kevin Budden, an amateur herpetologist, was one of the first people to capture a taipan alive, although he was bitten in the process and died the next day. The snake, which ended up dying a few weeks later, was the first known taipan to have been milked for venom: Melbourne zoologist David Fleay and Dr. F. C. Morgan performed the milking, and the venom was

used to develop an antivenom, which became available in 1955. The original preserved specimen is currently stored in the facilities of Museums Victoria.

Two antivenoms are available: CSL polyvalent antivenom and CSL taipan antivenom, both from CSL Limited in Australia.

In his book *Venom*, which explores the development of a taipan antivenom in Australia in the 1940s and 1950s, author Brendan James Murray states that only one person is known to have survived an *Oxyuranus* bite without antivenom: George Rosendale, a Guugu Yimithirr person bitten at Hope Vale in 1949. Murray writes that Rosendale's condition was so severe that nurses later showed him extracted samples of his own blood that were completely black in colour.

Temperament also varies from species to species. The inland taipan is generally shy, while the coastal taipan can be quite aggressive when cornered and actively defends itself.

Chomchomi Saap imagined based on Taipen and Indian Krait.

Info:: Wikipedia and other websites , credit goes to them .

I was raised by boys. I can hold my own, I can fight, and I love horror movies - simply for the scare factor and the surrealism.

Jessica Stroup

এই বইয়ের সমস্ত গল্প কল্পিত । এর সাথে কোনো স্থান, পাত্র বা জাতি ইত্যাদির কোনো মিল নেই । পুরোটাই আমার কল্পনা ।

কোনো মিল যদি কেউ পান তা নেহাৎ-ই কাকতলীয় ।

কোনো জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠি ইত্যাদিকে ছোট করার জন্য এই পুস্তক রচিত হয়নি । কোনো কুসংস্কারকে বাড়ানো অথবা প্রচার করাও এর উদ্দেশ্য নয় ।

নিছকই গল্প হিসেবে পড়বেন । আর আনন্দ নেবেন ।

আর গল্পের গরু তো গাছে ওঠেই তাইনা ?

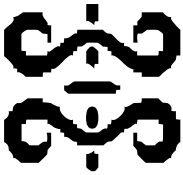

THE END